দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

বাম আমলে শিক্ষক নিয়োগ হতো আলিমুদ্দিন থেকে
— পৃঃ ১৩

তৃণমূল কংগ্রেসকে সর্বনাশা রাজনীতির ফল ভুগতে হবে
— পৃঃ ২৫

৭৫ বর্ষ, ৩৪ সংখ্যা।। ২৪ এপ্রিল, ২০২৩।। ১০ বৈশাখ - ১৪৩০।। যুগাব্দ - ৫১২৫।। website : www.eswastika.com

দণ্ডি কাটার দাসখত

টিএমসি-র ন্যক্কারজনক রাজনীতি

CENTURYPLY®

CENTURYPLY® CENTURYLAMINATES® CENTURYVENEERS®

CENTURYPRELAM® CENTURYMDF® CENTURYDOORS™

zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS

STARKE
NEW AGE PANELS

SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR

For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৫ বর্ষ ৩৪ সংখ্যা, ১০ বৈশাখ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

২৪ এপ্রিল - ২০২৩, যুগাব্দ - ৫১২৫,

Website : www.eswastika.com

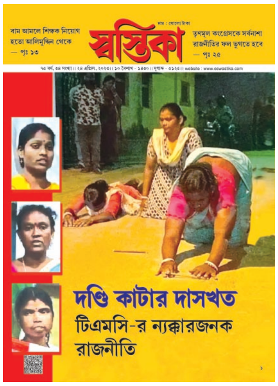

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

ফঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

চোরেদের দশদিন হলেও সাধুর একদিন হবেই
◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

তৃণমূল 'ফুস', সব্বাই খুশ
◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

ভিড়ে ভরা শ্রোতার সামনে শততম 'মন কী বাত'-এর নতুন দিগন্ত ◻ বদরী নারায়ণ ◻ ৮

ভারতের কূটনৈতিক চালে মাত চীন-পাকিস্তান
◻ বিশ্বামিত্র ◻ ১০

রাহুল গান্ধী কি আবার প্রত্যাবর্তন করতে পারবে
◻ রঞ্জন কুমার দে ◻ ১১

বাম আমলে শিক্ষক নিয়োগ হতো আলিমুদ্দিন থেকে
◻ সুদীপ্ত গুহ ◻ ১৩

সর্বোচ্চ আদালতের রায়ে তামিলনাড়ু সরকারের সঙ্ঘ বিরোধিতা ধোপে টিকল না ◻ মণীন্দ্রনাথ সাহা ◻ ১৬

পেট্রোল, ডিজেল ও রান্নার গ্যাসের দাম বৃদ্ধির ময়নাতদন্ত
◻ রসময় সরকার ◻ ১৮

দণ্ডি কাটার দাসখত ◻ রক্তিম দাস ◻ ২৩

তৃণমূল কংগ্রেসকে সর্বনাশা রাজনীতির ফল ভুগতে হবে
◻ বিমল শঙ্কর নন্দ ◻ ২৫

আদর্শ সংগঠন এবং প্রকৃত ধর্মসংস্থাপক আচার্য শঙ্কর
◻ ড. জয়ন্ত কুশারী ◻ ৩১

ধর্মতলায় ধর্মঠাকুর পূজা ◻ চন্দন রায় ◻ ৩৩

ডালখোলায়ও প্রশাসনের উসকানিতে রমনবমীর শোভাযাত্রা আক্রান্ত হয়েছে ◻ তরুণ কুমার পণ্ডিত ◻ ৩৫

মোদী সরকারের আমলে দেশের দারিদ্র্য হ্রাস
◻ সুদীপ নারায়ণ ঘোষ ◻ ৩৬

কান ধরে উঠ-বস করানোর শাস্তি এবং আধুনিক বিজ্ঞান
◻ ডা: আর এন দাস ◻ ৪৩

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে মুখ ফিরিয়েছিল মুসলমান সম্প্রদায় ◻ সনাতন বিদ্যার্থী ◻ ৪৩

হিন্দু রাষ্ট্র মানেই ধর্মীয় রাষ্ট্র নয় ◻ রবিশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় ◻ ৪৫

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ◻ অঙ্গনা : ২১ ◻ সুস্বাস্থ্য : ২২ ◻ সমাবেশ সমাচার : ২৮-৩০ ◻ খেলা: ৩৮ অন্যরকম : ৩৯ ◻ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ◻ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৮-৪৯ ◻ চিত্রকথা : ৫০

প্রকাশিত হবে
১ মে
২০২৩

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

প্রকাশিত হবে
১ মে
২০২৩

নবম অবতার বুদ্ধ

সনাতন হিন্দু ধর্মের আত্মা থেকে সৃষ্টি হয়েছিল বৌদ্ধধর্মের। জন্মেছিলেন অমিতাভ বুদ্ধ। কালক্রমে হিন্দুরা তাঁকে হিন্দু ধর্মের নবম অবতার হিসেবে মেনে নিয়েছে। তথাগত বুদ্ধদেবের পুণ্য আবির্ভাব উপলক্ষ্যে স্বস্তিকার আগামী সংখ্যার বিষয় : নবম অবতার বুদ্ধ।

লিখবেন— ড. জিষ্ণু বসু, অধ্যাপক অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ

দাম ষোলো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,
৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market Kolkata-700 006**

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে। এটি এক ধরনের অনুদান মাত্র। সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীর নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁরা যেন এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন এবং আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেকSubhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**
Bank A/c --- 103502000100693
IFSC -- IOBA0001035
Bank -- Indian Overseas Bank
Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

সর্বনাশা রাজনীতি

একসময় ভারতবর্ষে রাজনীতি শ্রেষ্ঠ নীতি বলিয়া পরিগণিত হইত। তখন তাহা পরিভাষিত হইত নীতির রাজা বলিয়া। সেই রাজনীতি তখন মানুষের জীবনকে শ্রেষ্ঠ পর্যায়ে উন্নীত করিয়াছিল। তখন ভারতবর্ষের রাজারা ছিলেন প্রকৃতপক্ষে প্রজাহিতৈষী। প্রজাসাধারণকে তাঁহারা সন্তানবৎ প্রতিপালন করিতেন। তাই রাজাদিগকে তখন নররূপী ঈশ্বর মনে করা হইত। বৈদেশিক আক্রমণের কারণে ভারতবর্ষে রাজনীতির ভাষা বদল হইয়াছে। রাজা অথবা শাসকের দলীয় কর্মকাণ্ডকেই রাজনীতি আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। যদিও সুস্থ রাজনীতির লক্ষণ হইল ন্যায়, নীতি ও আদর্শ অবলম্বন করিয়া জনগণের কল্যাণ সাধনের নিমিত্ত কাজ করা; কিন্তু বর্তমানে রাজনীতি পর্যবসিত হইয়াছে দলীয় স্বার্থপূর্তি এবং যে-কোনো প্রকারে ক্ষমতায় টিকিয়া থাকিবার মাধ্যম রূপে। তাহা সত্ত্বেও স্বাধীনতার পরও বেশ কয়েকজন রাজনীতিকের নাম দেশবাসী শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিয়া থাকেন যাঁহারা মূল্যবোধের রাজনীতি হইতে কখনোও বিচ্যুত হন নাই। তাঁহারা সংসদের উচ্চকক্ষ, নিম্নকক্ষ অথবা বিধান সভার গরিমা কখনো ক্ষুণ্ণ করেন নাই। জীবনের সর্বক্ষেত্রে এমনকী দলীয় কর্মকাণ্ডেও তাঁহারা কখনোও ইহার ব্যত্যয় ঘটান নাই। তাঁহারা শ্রেষ্ঠ নেতা অথবা জনপ্রতিনিধিরূপে দেশবাসীর হৃদয়ে স্থান করিয়া লইয়াছেন। ভারতে রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়ন অথবা স্বজনপোষণের নীতি আমদানি করিবার গৌরব অবশ্যই কংগ্রেস নামক দলটিকেই দিতে হইবে। স্বাধীনতা লাভের পূর্বেই ইহার প্রমাণ তাহারা রাখিয়াছে। পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট দলগুলি ইহার শুধু বাড়বাড়ন্তই করে নাই, হিংসা আমদানি করিয়া তাহাকে রক্তরঞ্জিতও করিয়াছে। একদা যে ভারতবর্ষে বিরোধী মত পোষণকারীর প্রতিও সম্মান প্রদর্শন করা হইত, সেই দেশেই কমিউনিস্টরা তাহাদের বিরুদ্ধ মত পোষণকারীকে শ্রেণীশত্রু নাম দিয়া খতমের রাজনীতি শুরু করিয়াছিল। খতমের রাজনীতিতে তাহারা দীর্ঘ চৌত্রিশ বৎসর পশ্চিমবঙ্গকে রক্তরঞ্জিত করিয়াছে। গ্রামবাঙ্গলার শান্তিপূর্ণ পরিবেশকে তাহারা কলুষিত করিয়াছে। পরিবারে পরিবারে হিংসার বীজ বপন করিয়াছে। কিন্তু অত্যাচার অবিচারকে মানুষ চিরদিন মানিয়া লয় না। কালক্রমে তাহারাও ক্ষমতাচ্যুত হইয়াছে। তাহাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বর্তমান শাসকদল অধিকতর হিংসার রাজনীতিতে এই রাজ্যকে দীর্ণ করিয়াছে এবং করিতেছে। কংগ্রেস দলেরই উপজাত এবং কমিউনিস্টদের শিক্ষায় উত্তমরূপে প্রশিক্ষিত তাহারা। এই মণিকাঞ্চন যোগে তাহারা কংগ্রেস ও কমিউনিস্টদেরও ম্লান করিয়া দিয়াছে। হিংসা, ঘৃণা, হত্যা, কুকীর্তি ও কুবাক্য বর্ষণে তাহারা শিরোপা অর্জন করিয়াছে। জনজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত রাষ্ট্রপতির চেহারা লইয়া তাহারা কটাক্ষ করিতে ছাড়েন নাই। যে জনজাতি সমাজ ভারতবর্ষীয় জীবনের অভিন্ন অঙ্গ; দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় যাহাদের অবদান দেশবাসী চিরদিন স্মরণে রাখিবে, তাহাদেরও চরমভাবে অপমান ও লাঞ্ছনা করিতে বর্তমান শাসকদল লজ্জাবোধ পর্যন্ত করিতেছে না। গণতান্ত্রিক দেশে সাধারণ মানুষ যে-কোনো দলকে সমর্থন করিতে অথবা ভোট দিতে পারেন। কিন্তু যাহারা তাহাদের একসময় সমর্থন করিতেন, পরিস্থিতি বিশেষে এখন করিতেছেন না, তাহাদের প্রতি চরম অপমান ও অসম্মান প্রদর্শন— ইহা গণতান্ত্রিক ও সভ্য দেশে কল্পনারও অতীত। কিন্তু ইহাই ঘটিয়াছে এই রাজ্যে। সম্প্রতি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তপন এলাকায় কয়েকজন জনজাতি সমাজের মানুষকে তৃণমূল দলের নেতা-নেত্রীরা তাহাই করিয়াছেন। বিজেপি দলভুক্ত হইবার কারণে জনজাতি সমাজের কয়েকজন মহিলাকে জেলা সদরে আনিয়া জেলা আদালত চত্বর হইতে এক কিলোমিটার দণ্ডী কাটিয়া পার্টি অফিসে আসিতে বাধ্য করিয়া তাঁহাদের হাতে দলীয় পতাকা ধরাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

এই ঘটনায় সমগ্র দেশের সম্মুখে পশ্চিমবঙ্গে শাসকদলের রাজনৈতিক দীনতা প্রকট হইয়া পড়িয়াছে। জনজাতি সমাজের মানুষ দেশ জুড়িয়া বিক্ষোভে শামিল হইয়াছে। গঠিত হইয়াছে আদিবাসী যৌথ মঞ্চ। জনজাতি সমাজের মানুষের অপমানে তাহারা ক্ষোভে ফুঁসিতেছে। বিক্ষোভের আঁচ অনুধাবন করিয়া দলের কয়েকজনকে দায়িত্বমুক্ত করা হইয়াছে। পুলিসকে দিয়া দুইজনকে গ্রেপ্তারও করানো হইয়াছে। কিন্তু জনজাতি সমাজের বক্তব্য হইল, মূল অভিযুক্তদের আড়াল করা হইয়াছে। এই ঘটনাই প্রমাণ করিতেছে, তৃণমূল দলটি মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করিয়া পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যটিকে খাদের একেবারে কিনারায় দাঁড় করাইয়া দিয়াছে। সর্বপ্রকার দুর্নীতিতে তাহারা সিদ্ধহস্ত হইয়াছে। চৌর্যবৃত্তিতে তাহারা শিরোপা অর্জন করিয়াছে। চোরের রানির শাসনে বাঙ্গালি আজ সর্বত্র উপহাসের পাত্রে পরিণত হইয়াছে। শাসকদলের সর্বোচ্চ নেত্রীর তাহাতে কোনোপ্রকার ভ্রূক্ষেপ নাই। ক্ষমতার দম্ভে তিনি ধরাকে সরা জ্ঞান করিতেছেন। এই রাজ্যে তিনি সর্বনাশা রাজনীতি আমদানি করিয়াছেন। মানুষের যোগ্য সম্মানটুকুও তিনি ও তাহার দল হরণ করিয়াছে। অপমানিত, লাঞ্ছিত জীবন আর কতদিন বাঙ্গালি ভোগ করিবে? এই প্রশ্নই এখন মানুষের মুখে মুখে ফিরিতেছে।

সুভাষিতম্

শতং বিহায় ভোক্তব্যং সহস্রং স্নানমাচরেৎ।
লক্ষং বিহায় দাতব্যং কোটিং ত্যক্ত্বা হরিং ভজেৎ।।

শত কাজ ফেলে রেখে ভোজন করা উচিত। হাজার কাজ ছেড়ে স্নান করা উচিত। লক্ষ কাজ ছেড়ে দান করা উচিত আর কোটি কাজ ছেড়ে ঈশ্বরের নাম স্মরণ করা উচিত।

চোরেদের দশদিন হলেও সাধুর একদিন হবেই

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

নোবেল স্মারক জয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার যোগ্যতা দেখেছিলেন। অস্পষ্ট ধারণা তৈরির অধিকার সবার রয়েছে। অমর্ত্যবাবুর ধারণা বাস্তবে খাপ খাচ্ছে না। গোদের উপর বিষফোঁড়া বিশ্বভারতীর উচ্ছেদ নোটিশ। বিদেশে থাকায় তিনি হয়তো জানেন না তৃণমূলের জাতীয় দলের তকমা খোয়া গিয়েছে। অনেকে বলছেন তৃণমূলের আম ও ছালা দুটোই গেল। তৃণমূল এখন শুধুই আঞ্চলিক দল। আদি কমিউনিস্টদের (সিপিআই) জাতীয় তকমাও বাতিল হয়ে গিয়েছে। না পালটানো দর্শন সারা পৃথিবীর কাছেই ব্রাত্য হতে বাধ্য। তার ভারতীয় সংস্করণের অন্তর্জলি যে হবে তা বলাই বাহুল্য। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ রাজ্য বিজেপিকে লোকসভা ভোটে ৩৫ আসন জেতার নিদান দিয়েছেন। বিধানসভার হিসেবে তা ২৪৫ আর পঞ্চায়েত গুনলে প্রায় এক লক্ষ আসন। বিশ্লেষকরা বলছেন, দাবিটা ঘোড়ার হাসার মতো। আমার কাছে ওটা টার্গেট বা লক্ষ্য। এখানে তা পূর্ণ করার চেষ্টাটাই বড়ো। করাটা নয়। তৃণমূলের অপরিণত নবীনরা কটাক্ষ করে বলছেন শাহ পক্ষান্তরে রাজ্য বিজেপিকে বুঝিয়ে দিয়েছেন তৃণমূলকে সরানো অসম্ভব। অবোধের গোবধে আনন্দ।

নবীন নেতারা হয়তো জানেন না সিপিএমকে সরানোর সময় তৃণমূলের কোনো জোরদার সংগঠন ছিল না। সিপিএমের অত্যাচার থেকে বাঁচতে রাজ্যের মানুষ পরিবর্তনের জন্য ভোট দিয়েছিলেন। এখন দুর্নীতির জোয়াল সরাতে তাঁরা আবার ওই কাজ করতে পারেন। কোনো সংগঠন বা ব্যক্তির প্রয়োজন পড়বে না। ১৯৭৭-এ কংগ্রেসকে হটানোর সময় বামেদের অসংখ্য মুখ ছিল। অনেক পরে জ্যোতি বসু সিপিএমের 'মুখ' হয়েছিলেন। পিতৃসত্য রক্ষার্থে শ্রীরামচন্দ্র চোদ্দ বছর বনবাসে কাটান। ২০২৫-এ তৃণমূল চোদ্দ বছর শাসনে পা দেবে। লোকসভা ভোটে বিজেপি জিতলে মমতার বনবাস তরান্বিত হবে। একটাই শর্ত ওই ভোটে রাজ্যের ৪২ লোকসভা আসনের মধ্যে বিজেপিকে ৩৫ জিততে হবে। রাজনীতির শিশুরাও জানেন এটা দুরূহ কাজ। বিজেপি পশ্চিমবঙ্গের দল হয়ে ওঠার মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে। দলবদলু দিয়ে যে তা হবে না তা একবার প্রমাণ হয়েছে।

'মুকুল' ফর্মূলা ছেড়ে বিজেপি তাই নতুন ফর্মূলা খুঁজছে। সিপিএমের ভোট কেটে মমতা জিতেছিলেন। কংগ্রেস, সিপিএম আর তৃণমূলের ভোট ঘুরিয়ে বিজেপি-কে সেই কাজ করতে হবে। ৫২ শতাংশ মমতা বিরোধী ভোট ভাগ হলে মমতা স্বচ্ছন্দে জিতে যাবেন। ২০২১-এর রাজ্য নির্বাচনে মমতার ৪৮ শতাংশ ভোটের একটা বড়ো অংশ ছিল কংগ্রেস আর সিপিএমের ভোট।

> **জাতীয় দলের তকমা চলে যাওয়ায় মমতার ডানা অনেকটাই ছেঁটে গিয়েছে। মমতার ছাঁটা ডানা বিজেপি আর কতটা ছাঁটতে পারে সেটাই দেখার।**

অমিত শাহ তাই নাক ঘুরিয়ে বলেছেন মমতা চাইলেও তাঁর ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হবেন না। বিজেপি থেকেই মুখ্যমন্ত্রী হবে। মমতা যেমন লড়াই করে সিপিএমকে হটিয়ে ছিলেন বিজেপিকে তাই করতে হবে। দল গড়ে তেরো বছরের মধ্যে কমিউনিস্ট জমানার দাঁড়ি টেনেছিলেন মমতা। আগামী বছর মমতা-শাসনের তেরো বছর শেষ হচ্ছে। তফাত একটাই। নতুন চরিত্রের দল হিসেবে এ রাজ্যে বিজেপি অনেকটাই নবীন।

রাজ্যের মানুষের চাহিদার সঙ্গে তা খাপ খাইয়ে নিতে হবে। কমিউনিস্ট শাসনের বিরুদ্ধে মমতার সংগ্রাম ছিল অবিন্যস্তভাবে রাজনৈতিক। সব শ্রেণীর মানুষকে তা টেনে নিয়েছিল। বিজেপির সে রেকর্ড নেই। মমতা 'দুর্নীতি-রানি'র দুর্নাম পাওয়ায় বিজেপির সুবিধা হয়েছে। তবে সে সুযোগ বিজেপি কতটা ব্যবহার করতে পারবে সেটাই দেখার। বিজেপির লড়াই ব্যক্তি মমতার দুর্নীতির বিরুদ্ধে। মমতার লড়াই ছিল সিপিএম অত্যাচারের বিরুদ্ধে। রাজ্যের বিরোধী বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী দলবদলু হলেও পুরোনো তকমা অনেকটাই ভেঙে ফেলেছেন। জনমানসে একটা ধারণা সৃষ্টি হয়েছে ভবিষ্যতে তিনি মমতার বদলি মুখ। বিচারাধীন হলেও মমতাকে হারানো শুভেন্দুবাবুর শ্লাঘা আর চালিকাশক্তি। মুখ্যমন্ত্রিত্বের লোভে মমতা সে হার মেনে নিতে পারেননি। মমতা নির্মোহ নেত্রী নন। জাতীয় দলের তকমা চলে যাওয়ায় মমতার ডানা অনেকটাই ছেঁটে গিয়েছে। মমতার ছাঁটা ডানা বিজেপি আর কতটা ছাঁটতে পারে সেটাই দেখার। সামনেই পঞ্চায়েত ভোট। রাজ্যের মানুষ জানেন চোরেরা দশদিন পেলেও সাধু একদিন জিতবেই। রাজ্যের মানুষের কাছে সেই সাধুর ঠিকানা রয়েছে।

তৃণমূল ‘ফুস’, সব্বাই খুশ

হুমকিদাত্রীষু দিদি,

ঠিকই করেছেন দিদি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের পদত্যাগ দাবি করে আপনি ঠিকই করেছেন। সত্যিই তো স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদে থাকার কোনো অধিকার নেই অমিত শাহের। বীরভূমের সিউড়িতে বিজেপির সভা থেকে শাহ বলেছিলেন, ২০২৬ সালের আগেই পশ্চিমবঙ্গের সরকার ফুস হয়ে যাবে। সেই সঙ্গে এই রাজ্য থেকে বিজেপিকে কমপক্ষে ৩৫ আসনে জিততে হবে বলেও মন্তব্য করেছিলেন তিনি। আর তাতেই রাজ্যে তৃণমূল সরকার ফুস হয়ে যাবে বলে মন্তব্য করেছিলেন। আপনি প্রশ্ন তুলেছেন, ‘কোন আইনে সরকার ফেলার কথা বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী?’ কিন্তু দিদি, আপনার কথা শুনে অনেকেই বলছেন, এটা কেমন প্রশ্ন হলো? কেউ যদি সত্যিই ফুস হয়ে যায়, আর তার আগাম ইঙ্গিত পাওয়া যায় তবে বলা যাবে না কেন? এ রাজ্যের বাচ্চা, বুড়ো সবাই জানে সরকার ফুস হয়েই গেছে। ভাবা যায় তিনজন বিধায়ক, তার মধ্যে একজন আবার রাজ্যের মন্ত্রী এবং আপনার দলের মহাসচিব পদে ছিলেন। কাড়ি কাড়ি টাকার ‘অশ্লীল’ ছবি বাংলা ভুলতে পারছে না। তাই সবাই বুঝে গিয়েছে দলটা গেছে। যে কোনওদিন খালি শেষ সার্টিফিকেট লিখে দিতে হবে ডাক্তারকে।

কিন্তু দিদি, আপনার সাহস নিয়ে লোকে বাহবা দিচ্ছে। বলছে, একটা দল শুধু এরটা রাজ্যে আটকে থাকার পরেও ভারতের তো বটেই, বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো রাজনৈতিক দলের অন্যতম শীর্ষ নেতাকে এটা বলতে দম লাগে। তবে আপনাকে ওঁরা বিশেষ পাত্তা দেয় না। আমি জানি এ নিয়ে আপনার খুব আক্ষেপ রয়েছে। এই তো সেদিন শুনলাম আপনি অভিমানী গলায় বলছিলেন, দু’দিন ধরে অবস্থানে বসলাম কেন্দ্র থেকে কেউ একটা ফোনও করল না! কেন করবে দিদি? আপনি কীসের দাবিতে ধরনায় বসেছিলেন? দাবিটা ছিল, চুরির হিসাব না দেওয়া সত্ত্বেও কেন্দ্রকে বাংলার

বকেয়া টাকা দিতে হবে। এটা কি হয় দিদি! আপনিই বলুন, হয়! আমি আপনার এত বড়ো অনুগামী হয়েও কিন্তু এটা ভাবতে পারছি না। চাকরি বিক্রি তবুও গা সওয়া হয়ে গিয়েছে দিদি, কিন্তু স্কুলের ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়েদের খাবারের জন্য কেন্দ্রের দেওয়া টাকার ১০০ কোটি চুরি তাও আবার মাত্র ছ’মাসে মেনে নিতে পারছি না। ভাবছি এই রকম কত ছ’মাস আপনি মানে আপনারা ক্ষমতায় ছিলেন। তাতে যদি ১০০ কোটি করে হয় তবে তো দুর্নীতির কোনও কূলকিনারা পাওয়া যাবে না। আসলে দিদি, গোটা দেশে এমন রাজ্য কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি। লালুপ্রসাদ যাদব গোরুর খাবার চুরি করে জেলে গিয়েছিলেন। তবে পড়ুয়াদের খাবার চুরির সাজা কী হতে পারে, ভেবেই আমার হাত-পা কাঁপছে।

তবে দিদি, বাঙ্গালির জন্য মজার উপাদান কম রাখেনি আপনার দল। সবচেয়ে ভালো খেলাটা দেখালেন আপনার বড়ঞার বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ। আপনার দাবি মতো তো বড়ঞার মানুষ আপনাকেই ভোট দিয়েছিল। আপনার মুখের দিকে তাকিয়ে। আপনিই তো প্রার্থী ছিলেন সর্বত্র। মোবাইল দুটো তো পাওয়া গিয়েছে দিদি। কী হবে! গোপন কিছু রয়েছে বলেই তো পুকুরে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া। কিন্তু কোনও লাভই হলো না। এদিকে সাধের ভাইপোকেও ডাকাডাকি চলছে। সোনা বৌমাকে কতদিন আড়াল করে রাখা যাবে জানি না।

এমতাবস্থায় বাঙ্গালি বলছে, অমিত শাহ রাজ্য এসে ভবিষ্যৎটাই বলে দিয়ে গিয়েছেন। তৃণমূল এবার সত্যিই ‘ফুস’ হয়ে যাবে। □

অতিথি কলম

বদরী নারায়ণ

ভিড়ে ভরা শ্রোতার সামনে শততম 'মন কী বাত'-এর নতুন দিগন্ত

ধনীদের সমাজ দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা, তাদের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিতে পারবে রেডিয়োধারী গ্রামীণ ভারতের প্রান্তিক মানুষের খবরের হাতিয়ার। স্মার্ট ফোন আর সোশ্যাল মিডিয়ার সঙ্গে লড়ে যাবে তারা।

আজ থেকে প্রায় আট বছর আগে নিতান্ত ঝিমিয়ে পড়া মূল ধারার রেডিয়ো অনুষ্ঠানে শুরু হয়েছিল 'মন কী বাত' নামের প্রায় কৌতূহলহীন এক অনুষ্ঠান। এটির নির্ঘণ্ট ছিল প্রতি মাসের শেষ রবিবার। ইতিমধ্যে ২০ বছর ধরে জাঁকিয়ে বসেছিল এফএম রেডিয়ো চ্যানেলগুলি। এরা মূলত পাশ্চাত্য ধারার আধুনিক সংগীত ও নৃত্য কনসার্টের সংগীতই পরিবেশন করে থাকে। তরুণ সমাজের কাছে স্বাভাবিকভাবেই এর আকর্ষণ দুর্বার। প্রাতঃকাল থেকেই এই চ্যানেলগুলি শুরু হয়ে যায়। একটা সময় বাসে উঠলেই অনুষ্ঠান পরিবেশকদের চটুল কণ্ঠে রাস্তার জ্যাম থেকে দিনের তাপমাত্রা সবই জানিয়ে দেওয়া হতো। কিন্তু জনতার কাছে এই চটুলতা এবং ঘোষকদের নিজেদের চাগিয়ে তোলার চেষ্টা কালজয়ী হতে পারেনি। নিত্য ব্যবহার যে কোনো বস্তুরই চিরস্থায়ী আকর্ষণ কেড়ে নেয়। কয়েক যুগ আগে রেডিয়োর চূড়ান্ত উৎকর্ষের সময় বহু সাপ্তাহিক চলচ্চিত্র-সংগীত বা নাটক দেশের সমস্ত রাজ্যব্যাপী একটি নিজস্ব পরিসর তৈরি করে নিয়েছিল। দেশের নানা বর্ণ জাতপাতের মানুষ কেউ বাড়িতে আবার অধিকাংশ চায়ের দোকান বাজার ইত্যাদিতে জড়ো হয়ে যৌথ আনন্দ উপভোগের ডবল মজা আত্মস্থ করত।

দিন বদলের সঙ্গে কালক্রমে রেডিয়োর এই সমস্ত অনুষ্ঠান মানুষের আকর্ষণ হারাল। আমার মনে পড়ে একটা সময়ে সাপ্তাহিক একটি রেডিয়ো অপেরা চলত 'লোহা সিং'। সেই স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে 'ভারতীয় বেতার পাটনা' থেকে অনুষ্ঠানটি সম্প্রচারিত হতো। বহু মানুষ গোষ্ঠীভুক্ত হয়ে বা বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে চা,পানের দোকান, বিভিন্ন চৌপলে গিয়ে অনুষ্ঠান শুনতে ভিড় জমাত। এই সময় একটা কথা খুব চালু ছিল 'নৌকরিয়া' অর্থাৎ যারা চাকরি করে। এর অর্থ তারা আর্থিকভাবে একটু বেশি সচ্ছল তাই তাদের বাড়িতে রেডিয়ো থাকবে আশা করা যায়। এই শব্দবন্ধটি মূলত উত্তর ও পূর্বভারতের বহু অংশে প্রচলিত ছিল। কিন্তু এ সবই ছিল রেডিয়োর দুর্বার যৌবনের দাপট। ৯০-এর দশকের পর রেডিয়োর জনপ্রিয়তা দ্রুত হ্রাস পেতে লাগল। চলে এলো দূরদর্শন। এরপর নানান বেসরকারি টিভি চ্যানেল এবং সর্বশেষ ওটিপি। এই ওটিপি এখন দাপিয়ে বেড়াচ্ছে।

এমন একটা পরিস্থিতিতে ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর নরেন্দ্র মোদী বললেন তিনি ভারতের গরিষ্ঠাংশ মানুষের সঙ্গে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করবেন। যার নাম দিলেন 'মন কী বাত'। অনেকে বিশেষ করে শহুরে বুদ্ধিজীবীরা কিছুটা হতবাক তো হলেনই, খাটো চোখে দেখলেন এই প্রচেষ্টাকে। কিন্তু আগামী ৩০ এপ্রিল এই ভারতপ্রিয় অনুষ্ঠানটির ১০০তম এপিসোডটি অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। আজ সেই সমস্ত অতি সূক্ষ্ম প্রজাতির বুদ্ধিজীবীরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন রেডিয়োর পুনরুজ্জীবনে প্রধানমন্ত্রীর এই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন চিন্তা কী আশ্চর্য ভূমিকা নিয়েছে। এবং তা কোনো ছোটো অঞ্চলে নয়, এই বিশাল ভারতের সমগ্র জনপদ জুড়ে। বহু সমালোচক বলেছিলেন যে এটি প্রায় দলীয় অনুষ্ঠান, বিজেপি কর্মীদের উজ্জীবিত করার জন্য প্রচারধর্মী বাক্যবর্ষণ। কিন্তু একটু নজর করলে দেখবেন এটি সাধারণ মানুষের সঙ্গে একটি চমৎকার যোগসূত্র তৈরি করেছে। সেই রেডিয়োর দাপট-যুগের পর দেশের কৃষক, শ্রমিক ট্রাক চালকরা দলে দলে পথের ধারের ধাবাগুলিতে বসে গ্রামীণ ভারতে নিবিড় মনোযোগে নির্দিষ্ট দিনে আবার অনুষ্ঠানটি শুনছে।

এটাও বলা দরকার যে এটি কখনই একপক্ষীয় যোগাযোগ রক্ষা করা নয়। খোঁজ নিয়ে জেনেছি দেশ জোড়া বেতার কেন্দ্রগুলি দেশের নানান প্রান্ত থেকে মানুষজনের হাজার হাজার পোস্টকার্ড, ইনল্যান্ড লেটার দপ্তরে পাচ্ছে। এই সমস্ত যোগাযোগ পথে বিভিন্ন নতুন জিজ্ঞাসা, প্রধানমন্ত্রীর প্রতি

নানান পরামর্শ, বিভিন্ন পর্বের ওপর অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মতামত তাঁরা ব্যক্ত করছেন। একেই তো বলে 'জন সংযোগ'। প্রধানমন্ত্রী দরকারে সেগুলি নিয়ে পরবর্তী এপিসোডে তাঁর মত দিচ্ছেন দেশবাসীর মধ্যে আর একটি প্রায় অতীত হয়ে যাওয়া চিঠিপত্র লেখারও নতুন প্রচলন হচ্ছে।

তাহলে রেডিয়ো নামের এই প্রায় মৃতকল্প মাধ্যমটিকে নতুন করে ব্যাপক ব্যবহারে লাগানো কেন? ভুলে যাবেন না ভারতীয় জনমানসে রেডিয়োর একটি অতি প্রাচীন মর্যাদা আছে। বহু বহু এমন মানুষ আছেন যাঁরা আজও কেবলমাত্র রেডিয়ো ও সংবাদপত্রকে খবর জানার অন্যতম বিশ্বাসযোগ্য মাধ্যম বলে মনে করেন। উদাহরণ নিয়ে বলা যায়, কারুর কারুর মুখে নিয়ম করে শোনা যায় 'রেডিয়োমে বাতায়া হ্যায়' বা আজ কা অখবার মে ছাপা হ্যায় (আজকের খবরের কাগজে দিয়েছে)। এর থেকে মনে হয় এই দুটি তুলনামূলক ভাবে পুরানো গণমাধ্যম গ্রামীণ বা আধা গ্রামীণ ভারতে পর্যাপ্ত প্রামাণ্যতাও ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা ভোগ করে।

অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, গ্রামীণ উত্তর ভারতে অত্যন্ত জনপ্রিয় গান আছে 'বাগিয়া ঘুমাদো গিয়া রেডিয়ো শুনা দা হো' অর্থ 'ওগো আমার প্রিয়তমা আমাকে একটু বাগানে নিয়ে গিয়ে রেডিওটা চালিয়ে দেবে'। রেডিয়োর প্রতি ভালোবাসার এটি পাথুরে প্রমাণ মোদীজীর 'মন কী বাত' দীর্ঘদিন মনের কোষাগারে সঞ্চিত এই স্মৃতিকেই জাগাতে চেয়েছে। বাস্তবে মোদী তাঁর নিজস্ব জনপ্রিয়তাকে পুঁজি হিসেবে কাজে লাগিয়ে রেডিয়োকে জনপ্রিয় করে তুলতে চেয়েছেন।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এটি একজন রাজনীতিবিদের সঙ্গে অরাজনৈতিক যোগাযোগ। সাধারণত মোদী 'মন কী বাত' চর্চায় রাজনৈতিক বিষয়কে এড়িয়ে চলেন। আমার বিষয়বস্তু নিয়ে যে মোটামুটি বিশ্লেশণ রয়েছে তাতে কতকগুলি নির্দিষ্ট ছাঁচ উঠে এসেছে। মূলত প্রধান দুটি বিষয়বস্তু রয়েছে— (১) অনুপ্রেরণামূলক, (২) আর একটি শ্রোতার মনের মধ্যে বা চিন্তার স্তরে একটা আকঙ্ক্ষার স্তর জাগিয়ে তোলা। একটা নতুন অনুভূতির উন্মেষ। দ্বিতীয় বিষয়টি যাতে শ্রোতাকে আকৃষ্ট করে তা বোঝাতে প্রধানমন্ত্রী যারা মূলত তৃণমূল স্তরে কাজ করে যেমন জলের সমস্যা রয়েছে বা পরিবেশ একেবারে দূষিত হয়ে পড়েছে যেহেতু সেখানে যে উন্নয়ন হয়েছে তা চারদিকের সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষা করে হয়নি তাদের প্রসঙ্গ তোলেন।

অনুপ্রেরণামূলক অংশটিকে উদাহরণ তুলে ধরতে বাস্তবে দেশের যে অংশে স্থানীয় উদ্যোগপতিরা (ছোটো জোট বেঁধে) কীভাবে স্থানীয় সমস্যার সমাধান করে সেখানে উন্নতির রাস্তা তৈরি করেছেন তা বর্ণনা করে অন্যদের মধ্যে তাদের আদর্শ বলে মানার (role model) উদাহরণ দেন। গ্রামীণ আলাপে এটাকে বলা হয় 'দেখা দেখি আগে বড়ানা' (অন্যকে দেখে নিজে নতুন সূচনা কর)। আর একটি তৃতীয় মাত্রার আলোচনা হয় প্রান্তিক জনজাতি মানুষদের নিয়ে তাদের যে ঐতিহাসিক বীর, তাদের মনে রাখার মতো অতীতের জনহিতকর কাজগুলি একই সঙ্গে তাদের শ্রেষ্ঠ পুরুষদের কথা আলোচনা করে তাদের মন থেকে সমস্ত হীনমন্যতাকে অপসারিত করা।

চতুর্থ যে বার্তাটি প্রায়শই পুনর্ঘোষিত হয় তাহলো সমাজের মধ্যে মাদক গ্রহণ প্রবণতাকে পরিহার করার ওপর সর্নির্বন্ধ অনুরোধ। সঙ্গে এটি বলা এই নেশাসক্তির জন্যই সমাজের বৃদ্ধি ও সামগ্রিক উন্নয়ন বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। সর্বশেষ বিষয়টি যাকে একেবারে যে যেখানে দাঁড়িয়ে সেই অঞ্চল বা বাসভূমি নিয়ে। এটি বিপুল ভাবে মনোহরা। Vocal for local-এর উৎস স্থল। স্থানীয় শিল্পকলা বা হাতের কাজ যা সেখানকার দীর্ঘদিনের বৈশিষ্ট সেটিকে মানুষের দরবারে আরও বেশি করে নিয়ে আসা। সেটির বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরা।

এই মন কী বাত অনুষ্ঠানে কোনো অঞ্চলের কোনো বিশেষ মানুষের কাজের উল্লেখ তাও আবার প্রধানমন্ত্রীর মুখে অনায়াসে সেখানকার বহু মানুষকে উজ্জীবিত করে তোলে। যাকে ইংরেজিতে বলে Trickle down effect—ওপর থেকে ধীরে ধীরে নীচে নেমে আসা। নির্যাস করলে দাঁড়ায়, এটি হলো রেডিয়োর পুনরাবিষ্কার এমন একটি সময় যখন mediascape রম রম করে চলছে। সমাজের নীচের দিকের বহু মানুষ এতে বিশ্বাস ও আশার পথ দেখতে পাচ্ছে। ধনীদের সমাজ দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা, তাদের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিতে পারবে রেডিয়োধারী গ্রামীণ ভারতের প্রান্তিক মানুষের খবরের হাতিয়ার। স্মার্ট ফোন আর সোশ্যাল মিডিয়ার সঙ্গে লড়ে যাবে তারা।

(লেখক—নির্দেশক, গোবিন্দবল্লভ পন্ত সোশ্যাল সায়েন্স ইনস্টিটিউট, প্রয়াগরাজ)

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার যে সকল বার্ষিক গ্রাহকের মেয়াদ শেষ হয়েছে বা শেষ হতে চলেছে তাঁদের কাছে বিনীত নিবেদন, আপনারা পরবর্তী বছরের জন্য গ্রাহকমূল্য ৭০০ টাকা অবিলম্বে জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণের মাধ্যমে আমাদের সহযোগিতা করুন। স্বস্তিকার প্রতিনিধির মাধ্যমেও টাকা পাঠাতে পারেন।

নতুন গ্রাহক হলে সম্পূর্ণ নাম-ঠিকানা, ফোন নম্বর (পিন কোড সহ) অবশ্যই পাঠাবেন।

ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

শোকসংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মালদহ জেলা সেবা প্রমুখ পঙ্কজ দাসের সহধর্মিণী অপর্ণা দাস গত ৮ এপ্রিল হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫০ বছর। তিনি তাঁর স্বামী ও ২ কন্যাকে রেখে গেছেন।

ভারতের কূটনৈতিক চালে মাত চীন-পাকিস্তান

ফের ভারতের কূটনৈতিক চালে বিপর্যস্ত পাকিস্তান ও চীন। স্বাভাবিকভাবেই পাকিস্তানের কূটনৈতিক ভাবে এই বিপর্যস্ত অবস্থায় তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে বন্ধু চীন। ঘটনা হলো, ভারত গত বছরের অর্থাৎ ২০২২ সালের মার্চ মাসে ছত্রিশ দেশের প্রতিনিধি নিয়ে আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ সম্মেলনের আয়োজন করেছিল কাশ্মীরে। তারপরেই ঠিক হয়েছিল জি-২০ গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির দুটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকও এবছর ভারত আয়োজন করবে কাশ্মীরেই। সেই ঘোষণানুযায়ী এবছর ২৬ থেকে ২৮ এপ্রিল লেহতে যুব-বিষয়ক এবং ২২ থেকে ২৪ মে কাশ্মীরের শ্রীনগরে পর্যটন সংক্রান্ত কার্যকরী গোষ্ঠীর বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা।

এই দিনক্ষণ প্রকাশ্যে আসার পরই গত বছরের ২৫ জুন পাকিস্তান এর প্রতিবাদ জানায়। ৩০ জুন পাকিস্তানের পাশে এসে সরাসরি দাঁড়ায় চীন। চীনের বিদেশমন্ত্রকের তরফে তাদের মুখপাত্র ঝাও লিজিয়ন বিবৃতি জারি করে বলেন, কাশ্মীর সমস্যার সঙ্গে জড়িত দুটো দেশ রাজনীতি বন্ধ করুক। আসলে পাকিস্তান ও চীন, দুদেশেরই সমস্যা হলো, ভারত কেন কাশ্মীরে এতো বড়ো বড়ো আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করছে? গত বছরের পরে এবছর সম্মেলনের সময় যত নিকটবর্তী হয়েছে, পাকিস্তান তত উচ্চকণ্ঠে সরব হয়েছে। গত ১৫ এপ্রিল ভারতের বিদেশমন্ত্রকের পক্ষ থেকে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, কাশ্মীরে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সুতরাং কাশ্মীরে ভারত আয়োজিত যে কোনো সম্মেলনের ব্যাপারে অন্য দেশের নাক গলানোর প্রয়োজন নেই।

এখন দেখার, বন্ধু পাকিস্তানের দুঃখে চীন জি-২০ সম্মেলন বয়কট করে কিনা। প্রসঙ্গত, জি-২০ হলো বিশ্বের কুড়িটি প্রধান অর্থনৈতিক শক্তির একটি বড়ো গোষ্ঠী। এতে ভারত, চীন ছাড়াও জাপান, ইন্দোনেশিয়া, সৌদি আরব, দক্ষিণ কোরিয়া, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং রাশিয়া, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, ইতালি, মেক্সিকো, তুরস্ক-সহ ইউরোপীয় ইউনিয়ন জি-২০ দেশগুলির অন্তর্ভুক্ত। বিভিন্ন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, কূটনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার মঞ্চ হিসেবে জি-২০-এর ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ২০২২ সালের শেষ দিক নয়াদিল্লির হাতেই বর্তেছে জি-২০-এর সভাপতিত্বের দায়িত্ব। এই বছরের ত্রিশ নভেম্বর পর্যন্ত থাকবে তার মেয়াদ। এই সময়কালীন পর্বে ভারতের সভাপতিত্বে ১১টি ক্ষেত্রে প্রায় দুশোটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। আন্তর্জাতিক কূটনীতির দুনিয়ায় নিজেদের অবস্থান মজবুত করতে স্বাভাবিকভাবেই ভারত জি-২০-র মঞ্চকে কাজে লাগাতে চাইবে। পাকিস্তানের সঙ্গে বন্ধুকৃত্য করা ছাড়াও আন্তর্জাতিক কূটনীতির দুনিয়ায় ভারতের এই মনোভাব চীনকে খুবই চাপে রেখেছে।

ভারত কেন কাশ্মীরকেই বেছে নিল, তার আন্তর্জাতিক কূটনীতি প্রকাশের জায়গা হিসেবে? কূটনীতিজ্ঞরা মনে করছেন, এর পেছনে আন্তর্জাতিক রাজনীতি, তার পেছনে ভারতের কৌশল নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু সেসব ছাপিয়ে জায়গা করে নিয়েছে কাশ্মীরের উন্নয়ন। অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কারণে কাশ্মীরকে ভূস্বর্গ অর্থাৎ পৃথিবীর মধ্যে স্বর্গ বলা হয়। কিন্তু ভারতেরই কিছু ক্ষমতাধর রাজনৈতিক নেতার অবিমৃশ্যকারিতায় সেই ভূস্বর্গ স্বাধীনতার পর থেকেই জঙ্গিদের বিচরণ ভূমিতে পরিণত হয়েছিল। এবং ভারতের মধ্যে থেকেও অন্য দেশ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছিল। ভারতীয় নাগরিকদের এখানে প্রবেশ করতে গেলে হয়তো পাশপোর্ট লাগতো না, কিন্তু নিজেদের দেশে স্বাধীনভাবে বিচরণের সুযোগ তারা এখানে পেতেন না। এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে ভারতের দুই পড়শি দেশ পাকিস্তান-চীন শুধু যে জম্মু-কাশ্মীর তথা ভারতে সন্ত্রাস আমদানি করতে পারছিল, তাই নয়, আন্তর্জাতিক কূটনীতিতেও ভারতকে ব্যাকফুটে ঠেলে দিয়েছিল।

> **ভারত কেন কাশ্মীরকেই বেছে নিল, তার আন্তর্জাতিক কূটনীতি প্রকশের জায়গা হিসেবে? কূটনীতিজ্ঞরা মনে করছেন, এর পেছনে আন্তর্জাতিক রাজনীতি, তার পেছনে ভারতের কৌশল নিশ্চয়ই আছে।**

দীর্ঘ সত্তর-বাহাত্তর বছরের এই অভিশাপ থেকে এক লহমায় মুক্তি ঘটেছিল ২০১৯-এ ৩৭০ ধারা বিলোপের মধ্যে দিয়ে। তার আগেই পুলওয়ামা বিস্ফোরণে ভারতীয় সেনাবাহিনীর হতাহত হওয়ার ঘটনা ঘটেছিল। এটা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। সত্তর-বাহাত্তর বছর ধরে চলে আসা ঘটনাপ্রবাহের পরম্পরা মাত্র। দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় এসে মোদী সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব পান অমিত শাহ। তাঁর নেতৃত্বে সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক জম্মু-কাশ্মীরে যাবতীয় বিভেদ দূর করে বাকি ভারতের সঙ্গে একাত্মকরণে সচেষ্ট হয়। এর সুফল আজ ফলছে। জম্মু-কাশ্মীরে শান্তি যেমন ফিরেছে, জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখ এই দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ঘোষণা করে প্রশাসনিক উন্নতিতেও সচেষ্ট হয়েছে কেন্দ্র। আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে ভারতের এই মরমি প্রয়াসে চীন-পাকিস্তান বিপর্যস্ত হয়ে রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের দোহাই দিয়ে কাশ্মীরে কেন জি-২০ ভুক্ত দেশের বৈঠক হচ্ছে এই প্রশ্ন তুলছে। ভারতের জবাবও এসেছে মোক্ষম সময়ে। যখন পাকিস্তানের অর্থনীতি ধ্বংসের মুখে এবং টাকা ধার দেওয়ার অছিলায় দক্ষিণ-পূর্ব দেশগুলিকে কেনার ব্যাপরে চীনের অসুদেশ্য প্রকাশ্যে চলে এসেছে। ☐

রাহুল গান্ধী কি আবার প্রত্যাবর্তন করতে পারবেন

রঞ্জন কুমার দে

কংগ্রেসের যুবরাজ রাহুল গান্ধী বিগত দিনে ভারত জোড়ো যাত্রায় বিভিন্নভাবে দেশের মধ্যমণি হওয়ার আপ্রাণ চেষ্টায় ছিলেন। প্রাপ্তির কোটা শূন্য না হলেও সংবাদমাধ্যমের উপর কংগ্রেসিদের অবশ্যই ক্ষোভ ছিল সেইভাবে গুরুত্ব না দেওয়ার। সাংসদ পদ খারিজে রাহুল অবশ্যই নিজের গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণ করার সুযোগ পেয়েছেন। রাফাল, ইভিএম, ১৫ লক্ষ ইত্যাদি ইস্যু কংগ্রেস-সহ বিরোধীদের দিকে যখন বুমেরাং হয়ে ফিরে আসছিল তখন তারা উদ্যোগপতি গৌতম আদানি ইস্যুতে শান দিচ্ছিল। রাহুল গান্ধী বলছেন তিনি প্রধানমন্ত্রী মোদীর চোখে নাকি একটি ভয় দেখতে পেয়েছেন, তাই নাকি তাঁর সাংসদ পদ খারিজ করা হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে ২০১৯-এর লোকসভায় কর্ণাটকের কোলারে একটি নির্বাচনী সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে রাহুল গান্ধী বলেছিলেন, যাদের নামের পদবিতে মোদী রয়েছে তারা সবাই চোর হয় কেন? উদাহরণস্বরূপ তিনি নরেন্দ্র মোদী, ললিত মোদী, নীরব মোদীদের নাম উল্লেখ করেছিলেন। তৎকালীন সময়ে সুরাটের বিজেপি বিধায়ক পূর্ণেশ মোদী ভারতীয় দণ্ড বিধান ধারা ৪৯৯ ও ৫০০-তে রাহুলের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা দায়ের করেন। উল্লেখ্য, মানহানি মামলায় অভিযুক্ত ক্ষমা প্রার্থনা চাইলে অধিকাংশ সময়ে আদালত মামলা নিষ্পত্তি করে দেয়। কিন্তু রাহুল সেইপথে যাননি বা তাঁর আইনি বিশেষজ্ঞরা হয়তো তাঁকে সঠিক পরামর্শ প্রদান না করায় আজ তাঁকে দু' বছরের সাজাপ্রাপ্ত আসামি হয়ে সাংসদ পদ খোয়াতে হলো। ভারতীয় সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০২ (১) এবং ১৯১ (১) অনুসারে যদি কোনো সাংসদ বা বিধানসভা সদস্য লাভজনক কোনো পদ আঁকড়ে থাকেন, মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন বা ভারতীয় বৈধ নাগরিক না হয়ে থাকেন, তাহলে তাঁর সাংসদ বা বিধায়ক পদ তৎক্ষণাৎ খারিজ হয়ে যেতে পারে। পদ অযোগ্য হওয়ার আরেকটি কারণ সংবিধানের দশমতম অনুসূচি, সেখানে দল বদল বিধান অনুযায়ী কোনো সদস্য পদ খারিজ হতে পারে।

এছাড়াও লোক প্রতিনিধিত্ব অধিনিয়ম ১৯৫১-এর ধারা ৮ (১), ৮ (২) এবং ৮ (৩) অনুযায়ী কোনো সাংসদ বা বিধায়কের সদস্য পদ রদের বিধান রয়েছে। ঘৃণাসূচক বক্তৃতা ধারা ৮ (১)-এর আওতায় আসে। ২০২২ সালের অক্টোবরে উত্তরপ্রদেশের রামপুরের বিধায়ক আজম খান এক ঘৃণাসূচক মামলায় তিন বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হওয়ায় তার বিধায়ক পদ খারিজ হয়। আজমপুত্র আবদুল্লাহ আজমেরও বিধায়ক পদ খারিজ হয়েছিল নির্বাচনী হলফনামায় মিথ্যে বয়সের জবানবন্দি দেওয়ার জন্য। ২০১৩ সালে রাজ্যসভার কংগ্রেস সাংসদ রশিদ মাসুদ এমবিবিএস আসন দুর্নীতিতে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় সাংসদ পদ খোয়াতে হয়েছিল। আরজেডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদব ২০১৩ সালে বহু চর্চিত পশুখাদ্য কেলেঙ্কারিতে দোষী প্রমাণিত হওয়ায় তাঁর লোকসভার সদস্য পদের বিলুপ্তি ঘটে। জেডিইউয়ের আরেক লোকসভা সদস্য জগদীশ শর্মাও একই দোষে সেই সময় সাংসদ পদ ছাড়তে বাধ্য হন। ধারা ৮ (২)-তে নিয়মবহির্ভূত খাদ্য মজুত, যৌতুক, খাদ্যদ্রব্য ভেজাল প্রভৃতি বেআইনি কাজে দোষী সাব্যস্ত হলে ছ' মাসের জেল ও সদস্যপদ খারিজ হওয়ার বিধান রয়েছে। ধারা ৮ (৩)-তে যদি কোনো সংসদ সদস্য দোষী সাব্যস্ত হন এবং দুই বা বেশি বছরের জন্য কারাদণ্ডিত হন তাহলে তিনি সদনের সদস্য হওয়ার যোগ্যতা হারাবেন। তবে অন্তিম সিদ্ধান্ত স্পিকার নেবেন। রাহুল গান্ধীকে ভারতীয় সাংবিধানিক অনুচ্ছেদ ১০২ (১) এবং প্রতিনিধিত্ব অধিনিয়ম ১৯৫১-এর ধারা ৮ (৩)-এর আওতায় ১৫ হাজার টাকা জরিমানা এবং দু' বছরের জন্য দণ্ডিত করা হয়েছে। রাহুল সেই সঙ্গে আগামী ৮ বছর ভোটে লড়তে পারবেন না এবং ভোটও দিতে পারবেন না।

> “আগামীতে কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান বিধানসভা নির্বাচন, তাই কংগ্রেস হয়তো রাহুল গান্ধীর শাস্তিকে সামনে রেখে ভোটারদের সহানুভূতি আদায়ের সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করবে।”

ফ: ২

যদিও রাহুল গান্ধী বারবার গলা উঁচু করে বলছেন তিনি কারও কাছে ক্ষমা চাইবেন না, কিন্তু ২০১৮ সালে মানহানির এক মামলায় রাহুল ক্ষমা চাওয়ার পর মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট তাঁকে সতর্ক করে দিয়েছিল আগামীতে যাতে এরকম বিনা প্রমাণে কারও উপরে দোষ চাপিয়ে না দেন। এছাড়াও ন্যাশনাল হেরাল্ড মামালায় রাহুল এখনো জামিনে রয়েছেন। পাটনা হাইকোর্টে 'মোদী' সম্বন্ধীয় মানহানিকর বক্তব্যের একটি মামলায় রাহুল গান্ধী জামিনে রয়েছেন। এছাড়াও ঝাড়খণ্ডে রাহুলের বিপক্ষে তিনটি মানহানি মামলা ঝুলছে। তারমধ্যে একটি মামলা সেই 'মোদী' পদবি সংক্রান্ত এবং বাকি দুটি হয়েছিল ২০১৮ সালে জবলপুরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে খুনি বলে মন্তব্য করায়। সবকয়টি মামলার শুনানি রয়েছে আগামীতে।

বিজেপি এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতি ঘৃণাসূচক মনোভাব বারবার রাহুলের বক্তব্যে ও মন্তব্যে ফুটে উঠেছে। রাহুলের ভারত জোড়োযাত্রা চলাকালীন হরিয়ানার কুরুক্ষেত্রে তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘকে একবিংশ শতাব্দীর কৌরব বলে সম্বোধন করেন। তিনি বলেন, 'বর্তমান কৌরবরা খাকি হাফপ্যান্ট পরে, হাতে লাঠি নেয়, আর শাখা তৈরি করে। দেশের ২-৩ জন কোটিপতি তাদের সঙ্গে রয়েছে।' এই মন্তব্যের জেরেই উত্তরাখণ্ডের হরিদ্বার হাইকোর্টে স্বয়ংসেবক অরুণ ভাদোরিয়া ভারতীয় দণ্ডবিধি ৪৯৯ ও ৫০০ ধারায় ফৌজদারি মানহানি মামলা দায়ের করেন। তাই রাহুল গান্ধী বর্তমানে যে মানহানি মামলায় কোণঠাসা হয়েছেন তা কাকতলীয় নয়। তাঁর মন্তব্যে তা বারবার প্রতিফলিত হয়েছে। তবে রাহুল গান্ধীর কাছে এখনো বিকল্প পথ খোলা রয়েছে প্রত্যাবর্তন করার। রাহুল নিজের পদ বহাল রাখতে সংসদের অধ্যক্ষের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে অনুচ্ছেদ ২২৬-এর আওতায় হাইকোর্ট এবং অনুচ্ছেদ ৩২-এ সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হতে পারেন।

যদি হাইকোর্ট রাহুল গান্ধীকে নির্দোষ ঘোষণা করে কিংবা সাজা কমিয়ে দেয় তাহলে তাঁর সদস্যপদ বহালের পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। আবার যদি কোর্ট আগের রায় বহাল রাখে এবং নির্বাচন কমিশন ওয়ানাড আসন নির্বাচনের ঘোষণা করে দেয় তাহলে রাহুল গান্ধী সুপ্রিম কোর্টে কমিশনের অধ্যাদেশের উপর চ্যালেঞ্জ জানাতে পারেন। কিন্তু নির্বাচন কমিশন একবার সেই আসনের অনুসূচি প্রকাশ করলে যে কোনো আদালত নির্বাচনী প্রক্রিয়া আটকাতে পারবে না। তাই নির্বাচন কমিশন ওয়ানাড আসন খালি ঘোষণা করলে তৎক্ষণাৎ রাহুলকে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হতে হবে। উল্লেখ্য, লাক্ষাদ্বীপের এনসিপির লোকসভার সদস্য মোহাম্মদ ফাইজাল ২০১৯ সালে নির্বাচনে জয়ী হলেও ২০০৯ সালের একটি হত্যার চেষ্টার মামলার রায়ে ২০১৯-এর ১১ জানুয়ারি তাঁর ১০ বছরের সাজা হয় এবং তার দু'দিন পর তিনি সাংসদ সদস্য পদের অযোগ্য ঘোষিত হন। তারপর জানুয়ারির ১৮ তারিখে নির্বাচন কমিশন ওই আসনের উপনির্বাচন ঘোষণা করলে ফাইজল কেরল হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। জানুয়ারির ২৭ তারিখে কোর্ট আগের রায়কে খারিজ করলে নির্বাচন কমিশন সেই উপনির্বাচন প্রত্যাহার করে এবং মোহাম্মদ ফাইজাল ক্রমে তাঁর সদস্যপদে বহাল হন।

রাহুল গান্ধীর সাংসদ পদ খারিজে আজ যারা বাক্‌স্বাধীনতা হননের প্রলাপ করছেন তাদের জানা উচিত তৎকালীন কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ আমলে ২০১৩ সালে এক জনহিতকর মামলার রায়ে সুপ্রিম কোর্ট একটি বৃহৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে জানায়, যদি কোনো বিধায়ক, সংসদ সদস্য, বিধান পরিষদের সদস্য কোনো অপরাধজনিত কাজে লিপ্ত হয়ে ন্যূনতম দু' বছরের জন্য সাজাপ্রাপ্ত হন তাহলে তাঁরা তৎক্ষণাৎ সদস্য পদের অযোগ্য ঘোষিত হবেন। শীর্ষ আদালত এও ঘোষণা করে যে কেন্দ্র সরকারের কাছে ধারা ৮ (৪) বাস্তবায়ন করার কোনো অধিকার নেই।

২০১৩ সালের আগস্ট মাসের ৩০ তারিখ তৎকালীন আইনমন্ত্রী কপিল সিব্বাল রাজ্যসভায় একটি বিল পেশ করেন। যেখানে লেখা ছিল যদি কোনো বিধায়ক, সাংসদ দোষী সাব্যস্ত হন তাহলে তাঁরা পদের বেতন পাবেন না, ভোটাধিকারও থাকবে না কিন্তু তাঁর সদস্য পদ বহাল থাকবে এবং আবেদনের সুযোগও পাবেন। বিলটি সংসদের বিবেচনাধীন থাকাকালীন ২০১৩ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর অর্ডিন্যান্স জারি করে কেন্দ্রীয় সরকার এবং সেটি তৎকালীন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জির কাছেও পাঠানো হয় অনুমোদনের জন্য। কিন্তু রাহুল গান্ধী ২৮ সেপ্টেম্বর এক সাংবাদিক বৈঠকে দলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গিয়ে অর্ডিন্যান্সের প্রতিলিপি ছিঁড়ে ফেলেন। অতঃপর নিরুপায় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ ২ অক্টোবর আমেরিকা থেকে ফিরে মন্ত্রীসভার বৈঠকে সেই বিল ও অর্ডিন্যান্স উভয়ই প্রত্যাহার করে নেন। তাই মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা বলেছেন, রাহুল গান্ধী যেহেতু এইরকম বিধানের পক্ষে ছিলেন তাই আজ কংগ্রেসের বিরুদ্ধাচারণ করা শোভা পায় না।

যাই হোক, আগামীতে কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান বিধানসভা নির্বাচন, তাই কংগ্রেস হয়তো রাহুল গান্ধীর শাস্তিকে সামনে রেখে ভোটারদের সহানুভূতি আদায়ের সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করবে। কংগ্রেস আজ যে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়েছে, সেরকম ইন্দিরা গান্ধীও পড়েছিলেন, জরুরি অবস্থা জারির কারণে তিনি নির্বাচনে হেরে ভূত হয়েছিলেন। সেজন্য তাঁকে জেলও খাটতে হয়েছিল। কিন্তু পরে তিনি বিজয়ীর বেশে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। সেইভাবে আজ রাহুল কি নিজেকে প্রমাণ করতে পারবেন নাকি শক্তিশালী প্রতিপক্ষ মোদীর সামনে দুমড়ে মুচড়ে ছিটকে পড়বেন, সেটা সময়ই বলবে! □

বাম আমলে শিক্ষক নিয়োগ হতো আলিমুদ্দিন থেকে

সুদীপ্ত গুহ

গত কয়েক সপ্তাহ তৃণমূল এবং সিপিএমের মধ্যে একটা কুনাট্যরঙ্গ আমরা দেখেছি শিক্ষক নিয়োগের দুর্নীতি নিয়ে। তৃণমূল কিছু পুরোনো তথ্য সামনে এনে প্রমাণ করার চেষ্টা করছে যে সিপিএমও তাদের মতোই শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি করেছে। প্রথমে সিপিএম বেশ আক্রমণাত্মক ছিল ও তৃণমূলের কাছে প্রমাণ দাবি করে। সঙ্গে তারা এটাও দাবি করে যে যদি তারা অন্যায় করে তবে তৃণমূল কেন ব্যবস্থা নেয়নি গত বারো বছর। উত্তরে তৃণমূল বলে তারা 'বদলা' নিতে আগ্রহী নয়। সেই জন্যই ব্যবস্থা নেয়নি। এরপরে তৃণমূল কিছু সিপিএম নেতার স্ত্রী ও আত্মীয়দের নাম প্রকাশ করে, যারা তাদের মতে তথাকথিত চিরকুটের মাধ্যমে চাকরি পেয়েছে। তখন সিপিএম আবার দাবি করে, তৃণমূলের শিক্ষামন্ত্রীও তাদের সময় চাকরি পান। তবে তাঁর চাকরি কীভাবে হয় সেই তদন্তও হোক। উত্তরে তৃণমূল শিক্ষামন্ত্রী কিছুটা পিছিয়ে আসেন। শোনা যায়, বর্তমান শিক্ষামন্ত্রীর বাবা একসময় সিপিএম পার্টির সদস্য ছিলেন এবং তিনি যে কলেজে পড়াতেন সেখানে অধ্যাপকদের নিয়োগে ব্রাহ্ম সমাজের একটা ভূমিকা ছিল। এবার শিক্ষামন্ত্রী বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর অনুমতি ছাড়া তিনি তদন্ত শুরু করবেন না। এই ধরনের কুনাট্যরঙ্গ সাধারণ বাঙ্গালিকে আবার মনে করিয়ে দিল, কীভাবে বাম আমলে প্রাইমারি শিক্ষক থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদে নিয়োগ হতো। বামেরা জানেন তাঁরা যতই অস্বীকার করুন, ৩৪ বছরের এই অন্যায় মানুষ একটুও ভোলেনি। তাই আত্মপক্ষসমর্থনে তাঁদের নতুন অস্ত্র, 'আমাদের সময় পয়সা নিয়ে নিয়োগ হয়নি'।

প্রথমে সিপিএম আমলে কীভাবে নিয়োগ হতো এবং সেই নিয়োগের ব্যাপারে তারা নিরপেক্ষতার প্রশ্নে Zero Percent Tolerance নীতি প্রয়োগ করতো তাঁর একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। নব্বইয়ের দশকেও ইঞ্জিনিয়ারিঙে স্নাতকোত্তর করার তেমন চল ছিল না বললেই চলে। আর সেটা করলেও পরে কেউ পিএইচডি করতেন বা অনেকে ম্যানেজমেন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্নাতকোত্তর করতেন। কিন্তু তৎকালীন যাদবপুর এসএফআই সভাপতি দু'বার ইঞ্জিনিয়ারিঙে স্নাতকোত্তর সারলেন, যাতে যাদবপুরে থেকে আরও বেশিদিন এসএফআই-এর নেতৃত্ব দেওয়া যায়। ইঞ্জিনিয়ারিঙের ইতিহাসে এটা হয়তো প্রথমবার। ১৯৯০-তে তিনি লেকচারারের চাকরিও পান। বিজ্ঞাপনে লেখা ছিল Post graduate in XXX Engineering with additional post graduate in YYY Engineering will be preferred। উদ্দেশ্য খুব পরিষ্কার। একটা মাছিও গলতে দেওয়া হবে না। ওই ছাত্রনেতা অধ্যাপক হওয়ার পরে যাদবপুরে একটা মাছি তিনি গলতে দেননি।

২০১১ পর্যন্ত যত নিয়োগ হয়েছে, সব আলিমুদ্দিন থেকেই এবং তিনিই নিয়ন্ত্রণ করতেন। হয় সিপিএম ঘরের ছেলে-মেয়ে, নয় এমন ছাত্র যারা পিএইচডি করেছেন সিপিএম শিক্ষকদের কাছে। এমনকী যারা স্বর্ণপদক প্রাপ্ত

হয়ে যাদবপুরে যোগ দিয়েছেন, তাদেরও কোথাও না কোথাও সিপিএম যোগ ছিল। এই ভদ্রলোককে আজকাল টিভিতে প্রায় প্রতিদিন দেখা যায় শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি নিয়ে ভাষণ দিতে। তিনি যাদবপুরে যোগ দিলে, তাঁর উত্তরসূরি এসএফআই সভাপতি তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। দ্বিতীয়বার স্নাতকোত্তর। কিন্তু বিভাগের একজন শিক্ষককে তাড়ানোর পরিকল্পনা শুরু হলো। একটা মিথ্যা কেস দেওয়া হলো। সেই সময় JUTA ছিল অরাজনৈতিক এবং ছাত্র সংসদ নকশালের।

যদিও নকশালদের ভোট দিত তাঁরা। প্রায় এক বছর আন্দোলন, ধর্মঘটের পরে ১১ মে ১৯৯৪ রাতে অনশন আন্দোলনরত ছাত্র-ছাত্রীদের যাদবপুর লোকাল কমিটির ৫০০ গুন্ডা নিয়ে এসে হামলা করা হলো যাতে তাঁরা শিক্ষকদের সমর্থন করা থেকে বিরত হন। চারিদিকে আলো বন্ধ করে দিলে ছাত্র-ছাত্রীরা চিৎকার শুরু করেন। পুলিশ যথারীতি আসেনি। কিন্তু বহু সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী ঘায়েল হয়। আন্দোলন থেমে যায়। পরবর্তীকালে ওই ছাত্রনেতা শিবপুরে চাকরি নেয়।

এখানে বর্ণনা করা হলো এই কারণে যাতে বোঝা যায় মাছি গলতে না দেবার ব্যাপারে এরা কত সিরিয়াস ছিল। কিন্তু এই স্বজনপোষণ দ্বারা নিয়োগ কি দুর্নীতির মাধ্যমে নিয়োগের চেয়ে কম ক্ষতিকর? এবং তাঁর চরিত্র কী? অনুপ্রেরণা কী? বিনাস্বার্থে কেন একটি গোষ্ঠীর মানুষ আরেকটি গোষ্ঠী উপকার করবে? উত্তর হলো, সাবভার্সন। হীরক রাজার ভাষায় 'মস্তিষ্ক প্রক্ষালন', সোভিয়েত গুপ্তচর সংস্থা কেজিবি তাঁদের মোট খরচের ৮০ শতাংশ খরচ করত এই প্রক্রিয়ায়। হীরক রাজার ভাষায়, শূলে চড়ান না, ফাঁসি দেওয়ান না, কেবল মগজ ধোলাই। কোনো দেশের সংবাদমাধ্যম, সাংস্কৃতি জগৎ তথা সাহিত্য/নাটক/চলচ্চিত্র এবং শিক্ষায় নিজেদের মানুষকে বসিয়ে, মাথাটা চিবিয়ে খেতে হবে। তারপর আর সেই দেশকে আক্রমণ করতে হবে না। এমনিই তাঁদের সব রসদ হাতে চলে আসবে নিজের হাতে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সিপিএম যেহেতু চীনপন্থী কমিউনিস্ট, সেহেতু বক্রেশ্বর ও সাগরদিঘি প্রকল্পে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম বয়লারের বরাত চীনের ড্যাং ফাং নামের কোম্পানিকে দেওয়া হয়। রাজীব গান্ধী সেই সময় জ্যোতিবাবুকে NTPC/ BHEL-কে দিয়ে বক্রেশ্বর তৈরির প্রস্তাব দিলে, সেটা তিনি মানেননি। কারণ জ্যোতিবাবুর ভয় ছিল রাজীব গান্ধী বানালে বরাত হয়তো দেওয়া হতো কোনো সোভিয়েত সংস্থাকে।

কিন্তু ক্ষতি কতটা হয়েছে? আবার যাদবপুরকেই উদাহরণ হিসেবে আনা যেতে পারে। যদিও গল্প সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই এক। গত সপ্তাহে একটি খবরে দেখা যায় IIT বোম্বে, খড়্গপুর, দিল্লি ও মাদ্রাজ QS র‍্যাঙ্কিঙে বিশ্বে ৫১ নম্বরে স্থান পেয়েছে। IIT বম্বের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিঙের বিভাগীয় প্রধান সেটা তাঁর সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ করেছেন। ঘটনা হচ্ছে, এই চারটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বড়ো সংখ্যক শিক্ষক বাঙ্গালি এবং তাঁরা তাদের জয়ের ধ্বজা তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ওড়াচ্ছেন আজ। ওই বিভাগীয় প্রধানই যাদবপুরের স্নাতক এবং স্ট্যান্ডফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচিত বিশ্বের প্রথম ২ শতাংশ বিজ্ঞানীর একজন। যিনি এখন মহারাষ্ট্র সরকারের বিভিন্ন কমিটিতে ওই রাজ্যের বিপর্যয় মোকাবিলা বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী ও উপমুখ্যমন্ত্রীকে পরামর্শ দেন।

আর যাদবপুর? যাদের ছাত্ররা উপরোক্ত চার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এই র‍্যাঙ্কিং এনে দিয়েছে? ২০০৮-এ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে IIT স্টেটাস দেবার কথা ঘোষণা করলে সেটা প্রত্যাখ্যান করেন যাদবপুরের সেই স্বজনপোষণে চাকরি পাওয়া শিক্ষকরা। ২০১৯-এ কেন্দ্র সরকার ইনস্টিটিউট অব এমিনান্স স্বীকৃতি দেবার ঘোষণা করলেও তাঁরা নেননি। কারণ গবেষণার দায়িত্ব বাড়বে। আরও উচ্চমেধার ছাত্র-ছাত্রী আসবে, যাদের পড়াতে আরও পড়াশোনা করতে হবে। IIT স্টেটাস পেলে দেশি বিদেশি অর্থে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাণ্ডার ভোরে যেত। ইনস্টিটিউট অব এমিনান্স পেলে শুধু কেন্দ্র ১৫০০ কোটি টাকা দিত। কিন্তু তাঁরা নেননি। আজ সেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অর্থাভাবে প্রাক্তনীদের কাছে অর্থ চাইছেন। আজ যাদবপুরের শিক্ষকরা শিবপুর বা দুর্গাপুরের সমান বেতন (ডিএ) চাইছেন। কিন্তু দায়িত্ব নেবেন না। আজ যদি স্বজনপোষণ না করে সেরা মেধার মানুষদের এই বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি দেওয়া হতো, তবে কম করে কিছু প্রতিবাদ তো আসতো?

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার অবস্থা আরও খারাপ। আশির দশক পর্যন্ত সরকারি ক্লাস ওয়ান আধিকারিকরা তাঁদের ছেলে-মেয়েদের সরকারি স্কুলে পাঠাতেন। আগের শতকের শেষ নাগাদই সরকারি গ্রুপ ডি কর্মীরাও তাঁদের সন্তানকে পাঠানো বন্ধ করে দেন। সেই সময় যদি স্বজনপোষণের মাধ্যমে শিক্ষক না নেওয়া হতো, তবে মাত্র দুই দশকে পুরো সমাজ একটা দেড়শো বছরের তৈরি শিক্ষা ব্যবস্থার উপর পুরো ভরসা হারাতো না।

ভরসা হারানোর কারণ বিবিধ।

(১) শিক্ষকরা নিম্নমানের এবং মধ্যমেধার। সেটা সবাই বোঝেন।

(২) যে মানুষটি অসদুপায়ে চাকরি পেয়েছেন, তিনি নিজেও একজন অসৎ মানুষ। তাঁর ব্যক্তিত্ব সাধারণ পড়ুয়াকে আকর্ষণ করে না। তিনি কোনো পড়ুয়াকে সৎভাবে জীবনযাপনের প্রস্তুতি নেবার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে পারেন না।

(৩) যেহেতু শিক্ষকরা অযোগ্য, সরকারও তাদের রক্ষা করতে বহুদিন সিলেবাস পরিবর্তন করেনি। ১৯৭৭-এর আগে যেখানে বাঙ্গালি সমাজে ধারণা ছিল যে মাধ্যমিক বোর্ড CBSE বা ICSE বোর্ডের চেয়ে উচ্চমানের, সেখানে আশির দশকের মাঝামাঝিই এই রাজ্যের ছেলে-মেয়েরা বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় পিছনের সারিতে যেতে শুরু করে। কারণ রাজ্য সরকার তাঁদের শিক্ষকদের মান বাঁচাতে সিলেবাস পালটায়নি।

(৪) মেরুদণ্ডহীনতা। যে মানুষ একটি রাজনৈতিক দলের কৃপায় চাকরি পান, তাঁর পক্ষে কোনো অন্যায়ের প্রতিবাদ করা সম্ভব হয় না। এমনকী আশির দশকের মাঝামাঝি যখন স্কুল থেকে জোর করে পড়ুয়াদের মিটিং-মিছিলে নিয়ে যাওয়া হতো, শিক্ষকরা নীরব ছিলেন। কেউ একবারও বলেননি, নেলসন মেন্ডেলা এলে লা মার্টস/ডন বস্কো, আর শহিদ মিনারে ধরনা হলে আমাদের ছেলে-মেয়েরা কেন?

(৫) সিস্টেমে এমনভাবে পচন ধরেছে যে, যে সকল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ স্কুলে এই ধরনের শিক্ষক নিয়োগ হয়নি, তারাও কৌলিন্য হারিয়েছে। সাউথ পয়েন্টের মালিক ইন্দ্রনাথ গুহ তাঁর স্কুল বিড়লাদের বিক্রি করে দেন এবং পরে নিজে ICSE বোর্ডের একটা স্কুল খোলেন। পরে সাউথ পয়েন্টও নিজে CBSE-তে প্রথম ১০০-তে ছাত্র পাঠাতো, সেখান থেকেও অভিভাবকরা সন্তানদের বের করে নিচ্ছে শুধুমাত্র পর্ষদের উপর ভরসা নেই বলে। পাঠ ভবন, নবনালন্দার একই অবস্থা। এমনকী যারা একসময়ে রামকৃষ্ণ মিশনে পড়ে সাফল্য পেয়েছেন, তারাও তাঁদের সন্তানদের সেখানে পাঠাননি। মূল কারণ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রতি অনাস্থা, স্কুল নয়। কারণ পর্ষদেও অযোগ্য লোক ভর্তি হয়ে পুরো সিস্টেমকে শেষ করে দিয়েছে।

আর ফলও হাতে নাতে। আজ কোনো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বাঙ্গালি নেই। কলকাতার ডাক্তার কোনো অপারেশনের পরামর্শ দিলে সব বাঙ্গালিই ভেলোরে যায় দ্বিতীয় মতামত নিতে। শাসক তৃণমূল কংগ্রেস, যারা নিজেদের বাঙ্গালির পার্টি বলে দাবি করেছে, তারা তাদের মামলা লড়তে যে উকিলদের উপর ভরসা করেন, তারা কেউ বাঙ্গালি নয়। তাঁদের ভোট লড়ার বুদ্ধিও দেয় বাঙ্গলার বাইরের মানুষ। কলকাতার ছেলে-মেয়েরাও রাজস্থানের কোটা এবং অন্ধ্রের হায়দরাবাদ যাচ্ছে স্কুলিং করতে। মুখ্যসচিব থেকে ডিজিপি বাঙ্গালি নয়। অধিকাংশ ডিএম, এসপি অবাঙ্গালি। ব্যাংকের ম্যানেজারদের বড়ো অংশ বাঙ্গালি

আমেরিকার ব্যাংক ডুবলে ভারতের স্টক মার্কেট যেমন পুরো রক্ষা পায় না, চীনে মারণ ভাইরাস এলে যেমন আফ্রিকা বাঁচে না, তেমনি সরকারি স্কুল ব্যবস্থা ডুবলে আপনিও বাঁচবেন না।

নয়। শিয়ালদা, হাওড়া, কলকাতা থেকে বিমানবন্দর বন্দর রেলস্টেশন কারও শীর্ষে বাঙ্গালি নেই। পৃথিবীর সব বড়ো টেক কোম্পানির শীর্ষে ভারতীয়। কিন্তু বাঙ্গালি নেই। আমাদের গড় সিনেমার আয় তেলুগু সিনেমার ১ শতাংশ। পুজোতে সেই পঞ্চাশ বছর আগের গান মাইকে বাজে। এক কথায় সব দিক থেকে সর্বনাশ।

আরেকটা জায়গায় খুব বড়ো প্রভাব রেখে গেছে তথাকথিত সৎভাবে স্বজনপোষণ করে শিক্ষক নিয়োগ করা এই শিক্ষাব্যবস্থায়। তা হলো গবেষণা। যার জন্য প্রথম প্রয়োজন সৎ এবং ভালো গুরু। জগদীশ বোস, সত্যেন বোস, প্রফুল্ল রায়, মেঘনাদ সাহা কোনো পরিকাঠামো ছাড়াই আন্তর্জাতিক মানের গবেষণা করেছেন। কলকাতায় ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বরের ওষুধ আবিষ্কার হয়। আমাদের রাজ্যের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী একজন নামি বিজ্ঞানী ছিলেন, যিনি সেই সময় ম্যাডাম কুরির মতো বিজ্ঞানীদের সঙ্গে তাঁর গবেষণার কাজ ভাগ করে নিতেন। আজ কোভিড মহামারিতে আমাদের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণাকেন্দ্র কী দিল? একটা ভ্যাকসিন? একটা ওষুধ? এখন গবেষণায় সাধারণ মানুষের কী হবে? আমেরিকা শুধু পেটেন্ট বিক্রি করে আমাদের থেকে বেশি জিডিপি যোগ করে তাঁদের সিস্টেমে, আর সেই পয়সায় মানুষকে সামাজিক সুরক্ষা দেয়।

শেষে একটা কথা বলা যায়, টাকা নিয়ে হোক বা না দিয়ে, অযোগ্য মানুষকে শিক্ষকতার সুযোগ দেওয়া আত্মঘাতী প্রবণতা। যে বাঙ্গালি ব্যবসা জানে না, চাকুরি না করলে মেয়ের বাবা কন্যাদান করে না, সেই বাঙ্গালি শিক্ষাক্ষেত্রে ১ শতাংশ দুর্নীতি করার বিলাসিতা করতে পারে না। আমাদের মতো মানুষের একমাত্র মুক্তি শিক্ষায়। আমরা যদি আমার নিজের সন্তানকে সেরা স্কুল/শিক্ষকের কাছে পাঠানোর ব্যাপারে কোনো আপোশ না করি, তবে সমাজকে কেন ছেড়ে দিচ্ছি অযোগ্য শিক্ষক তথা হায়নার হাতে? আমরা কি সুরক্ষিত থাকবো? গত ৪৫ বছর তো নিরীক্ষা করলাম? এবার কি শুধরোনোর সময় আসেনি? কেউ যেন না ভাবেন যে আমার সন্তান বেসরকারি স্কুলে যাচ্ছে, সরকারি স্কুল ডুবলে আমার কি। যারা নিজের সন্তানের রেজাল্টে ১০০-তে ৯৯ পেতে দেখে গতকাল আনন্দে ছিলেন এবং আজ সেই সন্তান কোনো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় না কৃতকার্য হওয়ায় হঠাৎ আশ্চর্য হচ্ছেন। তাঁদের জানাই, আপনার সন্তান কোনোদিন ৯৯ শতাংশ পায়নি। ওই বেসরকারি স্কুল ব্যবসা করতে এসেছে এবং আপনি তাঁদের খদ্দের। আপনাকে খুশি করার জন্য আপনার সন্তানকে নম্বর দিয়েছে, কিন্তু শিক্ষা দেয়নি। সরকারি স্কুল ডোবায় আপনি তাদের কাছে যেতে বাধ্য, তা জানে, আর তাই এই প্রতারণা। আমেরিকার ব্যাংক ডুবলে ভারতের স্টক মার্কেট যেমন পুরো রক্ষা পায় না, চীনে মারণ ভাইরাস এলে যেমন আফ্রিকা বাঁচে না, তেমনি সরকারি স্কুল ব্যবস্থা ডুবলে আপনিও বাঁচবেন না।

(লেখক একজন ইঞ্জিনিয়ার ও চার্টার্ড ফিনান্সিয়াল অ্যানালিস্ট)

সর্বোচ্চ আদালতের রায়ে তামিলনাড়ু সরকারের সঙ্ঘ বিরোধিতা ধোপে টিকল না

মণীন্দ্রনাথ সাহা

স্বাধীন ভারতেও সাংস্কৃতিক-সামাজিক সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘকে বারবার প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। অথচ বিদেশি মদতপুষ্ট ইসলামি জঙ্গি সংগঠন ভারতের বিভিন্ন রাজ্য সরকারের ছত্রছায়ায় পালিত হচ্ছে। পুলিশ তাদের জানিয়েছিলেন সঙ্ঘের কার্যকর্তারা। সেই অহিংস পথসঞ্চলন ঘিরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিঘ্নিত হতে পারে, নিষিদ্ধ পপুলার ফ্রন্ট অব ইন্ডিয়া (পিএফআই) হামলা চালাতে পারে, এই অজুহাতে সঙ্ঘের আবেদন খারিজ করে দিয়েছিল ডিএমকে সরকার। খায় স্ট্যালিন সরকার। সঙ্ঘের পথসঞ্চলনের অনুমতি দেয় মাদ্রাজ হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চও। এছাড়া ডিভিশন বেঞ্চ বলে, 'গণতন্ত্রের ভাষা যাতে বিপন্ন না হয়, সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার, বাক্‌স্বাধীনতা যাতে বজায় থাকে, তা দেখার ভার তামিলনাড়ু প্রশাসনের।'

কোনো খোঁজ রাখে না। এর শেষ কোথায়?

সাম্প্রদায়িক অশান্তি ছড়াতে পারে এই আশঙ্কায় সঙ্ঘের পথসঞ্চলন বন্ধ করার আবেদন জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে ধাক্কা খেয়েছে তামিলনাড়ু সরকার। ডিএমকে সরকারের স্পেশ্যাল লিভ পিটিশন শীর্ষ আদালত খারিজ করায়, তামিলনাড়ুতে পথসঞ্চলন করতে সঙ্ঘের আর কোনো বাধা রইল না।

গত বছর অক্টোবর মাসে স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব এবং গান্ধী জয়ন্তী পালনে তামিলনাড়ুতে পথসঞ্চলন করার জন্য এমকে স্ট্যালিন সরকারের কাছে আবেদন

এরপর তামিলনাড়ু সরকারের সেই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে গত বছর নভেম্বর মাসে মাদ্রাজ হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন সঙ্ঘের কার্যকর্তারা। হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ সঙ্ঘের আবেদনে সাড়া দিয়ে তাদের পথসঞ্চলন যাতে বাধাপ্রাপ্ত না হয়, তার নির্দেশ দেন মাদ্রাজ হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চের বিচারপতি। স্ট্যালিন সরকার সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ডিভিশন বেঞ্চে আবেদন করে। অন্যদিকে, সিঙ্গল বেঞ্চের রায় তুলে ধরে মাদ্রাজ হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে আপিল করেন সঙ্ঘের কার্যকর্তারা। সেখানেও এ বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে ধাক্কা

সঙ্ঘের পথসঞ্চলন ঘিরে তামিলনাড়ুতে অশান্তির আবহাওয়া তৈরি হতে পারে, এই আশঙ্কা প্রকাশ করে মাদ্রাজ হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ এবং সেইসঙ্গে পৃথকভাবে সিঙ্গল বেঞ্চের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিমকোর্টে আপিল করে তামিলনাড়ু প্রশাসন। সঙ্ঘের পথসঞ্চলনের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা উচিত বলে স্ট্যালিন সরকারের স্পেশাল লিভ পিটিশনে জানানো হয়। সেই মামলায় তামিলনাড়ু সরকারের আপত্তি খারিজ করে দিয়েছেন সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি ভি. রামাসুব্রহ্মণ্যমের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ।

মাদ্রাজ হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ—

‘গণতন্ত্রের ভাষা যাতে বিপন্ন না হয়, সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার, বাক্‌স্বাধীনতা যাতে বজায় থাকে, তা দেখার ভার তামিলনাড়ু প্রশাসনের বলে যে মন্তব্য করেছে তা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। স্ট্যালিন সরকার যদি জেনেই থাকে যে শান্তিপূর্ণ পথসঞ্চলন ঘিরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিঘ্নিত হতে পারে, নিষিদ্ধ পিএফআই জঙ্গি সংগঠন স্বয়ংসেবকদের ওপর হামলা চালাতে পারে, তাহলে সরকার করছেটা কী? খবর জানা সত্ত্বেও সরকার জঙ্গিদের খুঁজে বের করে আইনের হাতে তুলে দিচ্ছে না কেন? সরকারের পুলিশ ও প্রশাসন কি নপুংশক হয়ে গিয়েছে যে পিএফআই হামলা করতে পারে বলে তারা শঙ্কিত? তামিলনাড়ু রাজ্যবাসী কি স্ট্যালিন সরকারকে ক্ষমতায় বসিয়েছে জঙ্গিদের লালনপালন করার জন্য না জঙ্গিদের ভয়ে ভীত হয়ে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকার জন্য? আসলে ইদানীং বিজেপি বিরোধী বিভিন্ন রাজ্য সরকারের রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ এবং বিজেপির যে কোনো কর্মসূচিতে বাধা দান করে মুসলমানদের তুষ্ট করা যেন সেই সরকারের প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। উত্তরপ্রদেশ, অসম, ত্রিপুরা সরকার যদি জঙ্গিদের শিরদাঁড়া ভেঙে দিতে পারে তাহলে সেকুলার লেবেল সাঁটা সরকারগুলি তা পারে না কেন? স্ট্যালিন সরকারকে তাঁর এই ভণ্ডামির জন্য রাজ্যবাসীর কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

শুধু ডিএমকে নেতা সঙ্ঘ বিরোধী নন, ভারতে ধর্মনিরপেক্ষ নামক আলখাল্লা পরা যত রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবী নামক প্রাণী রয়েছে প্রত্যেকেই সঙ্ঘের আতঙ্কে ভীত-সন্ত্রস্ত। তারা সবসময় ভাবতে থাকেন, এই বুঝি সঙ্ঘের অমুক কর্মসূচিতে আমাদের তমুক মিষ্ট ফলটি হাতছাড়া হয়ে যাবে। স্ট্যালিন সঙ্ঘের পথ সঞ্চলন আটকাতে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন। কিন্তু আমরা জানি ১৯৪৮ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি গান্ধী হত্যার পর থেকে জওহরলাল নেহরু, ইন্দিরা গান্ধী প্রভৃতি কংগ্রেসি প্রধানমন্ত্রীরা নিজেদের ক্ষমতা বলে সঙ্ঘকে বারবার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন আর বারবার আদালতের গুঁতোয় পিছু হটে মুখ পুড়িয়েছেন। তবুও সঙ্ঘের বিষয়ে অপপ্রচার করা তারা বন্ধ করেনি, জরুরি অবস্থার সুযোগে সঙ্ঘকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার ফলে পরবর্তী ভোটে ইন্দিরা গান্ধীর দল এবং তিনি নিজে ভীষণভাবে পরাজিত হলে আফশোস করে বলেছিলেন— ‘সঙ্ঘকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা আমার জীবনে মস্তবড়ো ভুল।’ তবুও বর্তমান বিজেপি বিরোধী তথা বলা ভালো ভারত বিরোধী জেহাদিপ্রেমী রাজনীতিকরা প্রত্যেকেই সঙ্ঘকে গালিগালাজ করতে ব্যস্ত। তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক সময় সঙ্ঘের প্রশংসা করতেন, তিনিও এখন ওই সংগঠনকে গালিগালাজ করেন। তাঁর অনুপ্রেরণায় তাঁর দলের কলকাতার মধ্যে এক মিনি পাকিস্তানের প্রবক্তাও সঙ্ঘের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেন।

কংগ্রেসি শাসনকালে রাজ্যে রাজ্যে সঙ্ঘের কার্যালয়ে হামলা চালানো হতো। সঙ্ঘকে সিমির সমগোত্র বলে মিথ্যা প্রচার চালিয়ে তাকে নিষিদ্ধ করার দাবি তোলা হতো। কারণ, পঞ্চম সরসঙ্ঘচালক সুদর্শনজী নেহরু-গান্ধী পরিবারের গোপন ইতিহাস প্রকাশ করে হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিয়েছিলেন। চেপে রাখা মিথ্যার আবরণ উন্মোচন করেছিলেন। গায়ে জ্বালালাগা তো স্বাভাবিক। সঙ্ঘ ভারতীয় শিক্ষা সংস্কৃতি, ধর্ম, ঐতিহ্য সম্পর্কে যথেষ্ট শ্রদ্ধাভাজন, তাই মুসলমান ও খ্রিস্টান কট্টরপন্থীদের পদাশ্রিত কংগ্রেস-সহ সকল সেকুলারদের কাছে চক্ষুশূল স্বরূপ।

১৯২৫ সালে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ এবং কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম আর ১৮৮৫ সালে জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম। অথচ শুধুমাত্র দেশের সঙ্গে এবং দেশের হিন্দু জনগোষ্ঠীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্য কংগ্রেস-কমিউনিস্ট পার্টি এখন ক্ষয়িষ্ণু দল হিসেবে নিজেদের প্রমাণ করে চলেছে। পক্ষান্তরে, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ বিশাল মহীরূহে পরিণত হয়েছে। শুধু ভারতে নয়, বিশ্বের মধ্যে এতবড়ো স্বেচ্ছাসেবী সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন আর একটিও নেই। ১৯৬২ সালে চীন-ভারত যুদ্ধে, ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধে স্বয়ংসেবকরা যেভাবে দেশ রক্ষার্থে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন তার ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু। প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী সঙ্ঘের হিতচিন্তক ছিলেন। দেশে যে কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় উদ্ধারকাজে এবং ত্রাণসাহায্যে সবার আগে উপস্থিত হয়ে সেবাকাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন স্বয়ংসেবকরা। সঙ্ঘের এই সামাজিক সহমর্মিতায় আকৃষ্ট হয়ে যথেষ্ট প্রশংসা যেমন করেছেন তেমনি সঙ্ঘের বিভিন্ন শিবির ও অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণ, বিচারপতি কে টি থমাস, বিজ্ঞানী জি মাধবন নায়ার, বিজ্ঞানী কে রাধাকৃষ্ণনের মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। কিন্তু তামিলনাড়ুর এই সবজান্তা নেতা দেশের এই মহান সংগঠনকে নিয়ে যে খেলা শুরু করেছেন তা হয়তো তাঁর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎকে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যেতেও পারে।

যতই বাধা আসুক, যতই প্রতিবন্ধকতা আসুক, দেশের কোনে কোনে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে হিন্দুরা। সমস্ত হিন্দুকে একটি কথা মনে রাখতে হবে, দেশের হিন্দু সমাজকে নেতৃত্ব দেওয়ার ভার রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসবক সঙ্ঘের উপরেই প্রদান করতে হবে। একমাত্র সঙ্ঘই হিন্দু সমাজকে পথ দেখাতে সক্ষম। অন্যান্য রাজ্য-সহ তামিলনাড়ুর জনগণও আজ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘকেই তাদের অভিভাবক হিসেবে মেনে নিয়েছে। সুতরাং দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয়, সমস্ত বিষয়েই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘকেই দেশ তথা হিন্দু সমাজের অভিভাবকের ভূমিকা পালন করতে হবে।

যে অরাজনৈতিক সংগঠন ১৯২৫ সাল থেকে এ পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বের বিস্ময়রূপে শতবর্ষের দিকে এগিয়ে চলেছে সেই সঙ্ঘের গরিমা উপলব্ধি করা ভারত বিরোধী হিন্দুদ্রোহী, পাকিস্তানপ্রেমী এবং জেহাদি মুসলমান তোষণকারী রাজনৈতিক নেতা-নেত্রী এবং সেকুলারদের পক্ষে সম্ভব নয়। সারা বিশ্ব বিস্ময়ে দেখছে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের সুযোগ্য নেতৃত্বে ভারত আবার বিশ্বসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করার দিকে এগিয়ে চলেছে। □

পেট্রোল, ডিজেল ও রান্নার গ্যাসের দাম বৃদ্ধির ময়না তদন্ত

রসময় সরকার

আজকাল প্রায়শই অফিস, আদালত, স্কুল-কলেজ, চায়ের দোকান বা পাড়ার আড্ডায় একটি কথা খুব শোনা যায়, তা হলো— পেট্রোল, ডিজেল, রান্নার গ্যাসের দাম বৃদ্ধি। কীরকম দাম বৃদ্ধি হয়েছে তা নিয়ে কোনো তর্কে না গিয়ে সঠিক তথ্য জানা যাক।

এই নিবন্ধে যে দামের উল্লেখ করা হবে সেই দাম বা মূল্য আমাদের দেশের রাজধানী দিল্লির। রাজ্যগুলির দাম এখানে উল্লেখ করা হয়নি এই কারণে যেহেতু ভ্যাট বা ট্যাক্সের পার্থক্যের কারণে পেট্রোল, ডিজেল ইত্যাদির দাম একেক রাজ্যে একেক রকমের হয়ে থাকে।

২০০৪ সালের মে মাসে যখন কংগ্রেসের মনমোহন সিংহ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে প্রথম শপথ নিলেন তখন এক লিটার পেট্রোলের দাম ছিল ৩৩.৭১ টাকা। মনমোহন সিংহের দশ বছরের রাজত্বের শেষের দিকে আর বিজেপির নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দিল্লির গদিতে বসার আগে ২০১৪ সালে ১ মার্চ পেট্রোলের মূল্য দিল্লিতে এক লিটার ৭৩.১৬ টাকা। অর্থাৎ মনমোহন সিংহের দশ বছরের শাসনে পেট্রোলের মূল্যবৃদ্ধি ১০ বছরে প্রায় ১১৭.০২ শতাংশ হয়েছিল। অন্যদিকে নরেন্দ্র মোদীর প্রধানমন্ত্রিত্বকালে ২০১৪ থেকে ২০২৩-এ প্রায় ৯ বছর পরে এক লিটার পেট্রোলের মূল্য দিল্লিতে প্রায় ১০০ টাকা। যদি মনমোহন সিংহের আমলের মতো পেট্রোলের মূল্য বৃদ্ধি মোদীজীর আমলে হতো তাহলে এক লিটার পেট্রোলের বর্তমান দাম বা মূল্য হতো ১৪৯.৯৭ টাকা বা প্রায় ১৫০ টাকা।

২০০৪ সালে মে মাসে যখন মনমোহন সিংহ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে প্রথম শপথ নিলেন বা দিল্লির গতিতে বসলেন তখন এক লিটার ডিজেলের দাম ছিল ২১.৭৪ টাকা। মনমোহন সিংহের দশ বছরের রাজত্বের শেষের দিকে আর বিজেপির নরেন্দ্র মোদীর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দিল্লির গদিতে বসার আগে ২০১৪ সালের ১ মার্চ ডিজেলের মূল্য দিল্লিতে এক লিটার ৫৫.৪৮ টাকা। অর্থাৎ মনমোহন সিংহের দশ বছরের শাসনে বা ইউপিএ সরকারের আমলে ডিজেলের মূল্য যদি এই বিজেপি সরকারের আমলে বা মোদীজীর আমলে বৃদ্ধি পেত তাহলে এক লিটার ডিজেলের বর্তমান মূল্য হতো ২১২.০৬ টাকা বা প্রায় ২১২ টাকা।

২০০৪ সালের মে মাসে যখন মনমোহন সিংহ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে প্রথম শপথ নিলেন বা দিল্লির গদিতে বসলেন তখন সাবসিডি ছাড়া ১৪.২০ কেজি ওজনের একটি রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডারের দাম ছিল ২৬১ টাকা। সিংহের দশ বছরের রাজত্বের শেষের দিকে আর নরেন্দ্র মোদীর প্রধানমন্ত্রীর দিল্লির গদিতে বসার আগে ২০১৪ সালের ১ জানুয়ারি সাবসিডি ছাড়া ১৪.২০ কেজি ওজনের একটি রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডারের মূল্যবৃদ্ধি প্রায় ২৫৫ শতাংশ হয়েছিল। অন্যদিকে নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রিত্বকালে ২০১৪ থেকে ২০২৩-এ প্রায় ৯ বছর পরে সাবসিডি ছাড়া ১৪.২০ কেজি ওজনের একটি রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডারের দাম মোদী সরকারের আমলে সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পেত তাহলে সাবসিডি ছাড়া ১৪.২০ কেজি ওজনের একটি রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডারের বর্তমান দাম হতো ৩০৫৭.৭৬ টাকা। (বর্তমানে ত্রিপুরার দাম ১২৬৩.৫০ টাকা।)

এই পরিসংখ্যান দেখে বোঝা যাবে নরেন্দ্র মোদীর আমলে পেট্রোল, ডিজেল, রান্নার গ্যাসের দাম আকাশ ছোঁয়া বৃদ্ধি পেয়েছে কি না? তাছাড়া পেট্রোল, ডিজেলের দাম ভারত সরকার একতরফা ভাবে বৃদ্ধি করতে পারে না। অপরিশোধিত তেলের আন্তর্জাতিক দাম বৃদ্ধি হ্রাসের সঙ্গে এর দাম বৃদ্ধি-হ্রাস হয়ে থাকে। তবে দাম বৃদ্ধি-হ্রাস সাময়িক। মোদ্দা কথা আগের সরকারের সঙ্গে বর্তমান সরকারের দাম বৃদ্ধির তুলনামূলক বিচারই এখানে কাম্য।

আমরা যখন কোনো একটি জিনিস বাজার থেকে কিনে আনতে চাই তখন আমরা যাচাই করি জিনিসটার কোয়ালিটি ও কোয়ানটিটি এক অথচ কোন্ দোকানে জিনিসটা তুলনামূলকভাবে দামে সস্তা বা কম। যে দোকানে জিনিসটার দাম তুলনামূলকভাবে দামে কম বা সস্তা সে দোকানকেই আমরা বেশি পছন্দ করি। রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীরা ভোটের জন্য কমিয়ে বাড়িয়ে দাম বা মূল্য বলতেই পারেন। এটা না করলে তাঁরা ভোট কীভাবে চাইবেন? কিন্তু শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের উচিত সঠিক তথ্য জানা। চিলে কান নিয়ে গেছে কেউ বললেই আমাদের উচিত নয় চিলের পিছনে দৌড়ানো। আমাদের সবার আগে কানে হাত দিয়ে দেখতে হবে যে কানটা সত্যি সত্যি আছে কি-না? □

মুঘল ইতিহাস গর্বের নয়, পড়ানো হোক ভারতের গৌরবময় ইতিহাস

মুঘল ইতিহাস গর্বের নয়, পড়ানো হোক ভারতের গৌরবময় ইতিহাস। যত শীঘ্র এটি কার্যকরী করা হয় ততই দেশের মঙ্গল। অতি আশ্চর্যের বিষয়, দেশের স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরেও পাঠ্যপুস্তকে এগুলি স্থান পায় বা রাখা হয় কেন? তবে তৎকালীন শাসকদের এবং ভারত আক্রমণকারীদের নারকীয় অত্যাচারের ঘটনা আমাদের বিস্মৃত হলে চলবে না। ভারত আক্রমণকারী তৈমুর লং দিল্লি আক্রমণের আগের রাত্রে এক লক্ষ বন্দি নিরস্ত্র হিন্দুকে হত্যা করে যমুনার জলে ভাসিয়ে দিয়েছিল। ফলে যমুনার জল রক্তের লাল বর্ণ ধারণ করেছিল আর যমুনার স্রোত স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। সুলতান মামুদ ১৭ বার ভারত আক্রমণ করেছিল আর প্রায় প্রতিবারই গুজরাটের সোমনাথ মন্দির লুঠপাট করে সম্পদ আহরণ করে মন্দির ধ্বংস করেছিল। সোমনাথের বিগ্রহটি গজনি নিয়ে গিয়ে ভেঙে টুকরো টুকরো করে বিভিন্ন মসজিদের সোপান শ্রেণীতে প্রোথিত করেছিল।

সুলতান মামুদ মথুরায় কৃষ্ণের জন্মভূমি এবং বাল্যের লীলাভূমি হিন্দুর রক্তে কর্দমাক্ত করেছিল আর মামুদের সেনারা হিন্দু রমণীদের সম্ভ্রম নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছিল, পরে তাদের গজনির দাসবাজারে ক্রীতদাসী হিসেবে বিক্রি করে দিয়েছিল। এরপর লুঠেরা আহমেদ শাহ আবদালি, নাদির শাহ প্রভৃতি এসেছিল। মুঘল শাসকরাও কেউ গঙ্গাজলে ধোয়া তুলসীপাতা ছিল না। মুঘল সেনাপতি মির বাকির অযোধ্যায় রামমন্দির ধ্বংসের ঘটনা আমরা সবাই জানি। যে মুঘল সম্রাট আকবরকে আমরা 'মহানুভব' বলে জানি, যুদ্ধে পরাজিত রাজাদের সঙ্গে তার সন্ধির প্রথম শর্তই ছিল তাদের স্ত্রী, ভগিনী বা কন্যাদের কাউকে তার হারেমে পাঠাতে হবে। আকবরের সেনাপতি মানসিংহ বাধ্য হয়েছিল তার ভগিনী যোধাবাঈকে আকবরের হারেমে পাঠাতে। এই সমস্ত নোংরা ঘটনা পাঠ্যপুস্তকে না থাকাই বাঞ্ছনীয়, তবে বিস্মৃত হলে চলবে না।

—**শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়,**
ডেজিরে কমপ্লেক্স, বড়বাজার,
চন্দননগর।

ইতিহাস থেকে ইতিহাস বাদের প্রকৃত কারণ জানা দরকার

ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশনাল রিসার্চ সেন্টার অ্যান্ড ট্রেনিঙের (এনসিইআরটি) প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বাদশ শ্রেণীর ইতিহাস থেকে বাদ গেছে নাকি মুঘল রাজত্বের ইতিহাস। ওই ইতিহাস বইয়ের তিনটি পার্ট আছে— পার্ট ১, পার্ট ২, পার্ট ৩। ১৫টা চ্যাপটার আছে। এই ১৫টা চ্যাপটারের মধ্যে ৮ ও ৯-এ মুঘল সাম্রাজ্যের ইতিহাস আছে। বাদ গেছে শুধু চ্যাপটার ৯, সেখানেও আছে মুঘল রাজত্বের ইতিহাস। সেই সঙ্গে বাদ গেছে চ্যাপটার ১২ ও ১৪। বর্তমান ইতিহাসের পাঠ্যসূচি ১৫ থেকে কমে গিয়ে ১২টা চ্যাপটার নিয়ে তৈরি হয়েছে। চ্যাপটার ১২-তে আছে colonial states এবং চ্যাপটার ১৪-তে আছে understanding partition। এখন জানবো চ্যাপটার ৮-এ কী আছে যা সিলেবাস থেকে বাদ দেওয়া হয়নি। এখানে আছে কৃষক, জমিদার, রাজ্য এবং সমাজ ব্যবস্থা এবং মুঘল সাম্রাজ্যবাদ। আর আছে বাদশাহদের নাম ও তাদের কোর্ট। চ্যাপটার ৯ থেকে বাদ গেছে। ১. মুঘল সভাকবিদের লেখা ক্রনিকল, তার ম্যানুসক্রিপ্ট, ডিজাইন, ছবি, ২. মুঘল কোর্টের ছবি, প্রশংসা, ৩. আকবরনামা ও বাদশাহনামা, ৪. সভা কবিরা কীভাবে মুঘল সাম্রাজ্যকে আদর্শ রাষ্ট্র হিসেবে পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। ৫. মুঘল রাজধানী ও কোর্টের বিবরণ, উপাধি, রাজন্যবর্গের নিযুক্তি, তাদের খাওয়া, থাকা, জায়গার বিবরণ। ৬. দূর থেকে রাজ্য শাসনের পদ্ধতি। ৭. খ্রিস্টান পাদরিদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক, ধর্মীয় ব্যাপার মুঘলদের ঔদার্য। কেন এই পরিবর্তন করছে এনসিইআরটি যুক্তি দিয়ে বলছে— The content of the textbook has been rationalized for varios reasons includign overloading with similar content in other subject areas in the same class. Similar conted included in the lower or higher class on the same subject। নতুন শিক্ষা নীতি ২০২০-র লক্ষ্যও তাই।

ইতিহাসের এই সংযোজন এবং বিয়োজন নিয়ে প্রথমে কোনো বিতর্ক সৃষ্টি হয়নি। যখন উত্তরপ্রদেশ সরকার ঘোষণা করে ওই সিলেবাস অনুযায়ী তাদের দ্বাদশ শ্রেণীর ইতিহাসের পাঠ্যসূচি পরিবর্তন করবে, তখন সমাজবাদী পার্টি হইচই শুরু করে। তাই সিলেবাস পরিবর্তন রাজনৈতিক কারণ হয়ে ওঠে। আসলে মুঘলদের ইতিহাস বাদ যায়নি, চ্যাপটার ৯, চ্যাপটার ৮-এর পুনরাবৃত্তি হচ্ছিল বলে বাদ গেছে। প্রথম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শুধু ইতিহাস নয়, বিজ্ঞান-সহ অনেক কিছু পরিবর্তন হয়েছে। সিলেবাসের আধুনিকীকরণ, বৈজ্ঞানিক, যুক্তিবাদী, সৃষ্টিশীল, সৃজনশীল করার লক্ষ্যে এই পরিবর্তন। এখানে কোনো বিভাজন নয়, শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠনের প্রধান লক্ষ্য। কতটুকু পরিবর্তন হয়েছে এবং কী পরিবর্তন হয়েছে তা ভালোভাবে জানা দরকার। পাঠ্যসূচিতে মুঘল সাম্রাজ্য নিয়ে আগে যা ছিল এখন তাই আছে। চ্যাপটার ৯ থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কথা বাদ গেছে তা নিয়ে কিন্তু হইচই হচ্ছে না। রাজনৈতিক মঞ্চ তৈরি জন্যে এমনটা হইচই হচ্ছে, এটা জনগণের জানা দরকার। শিক্ষা যুগ্ম তালিকাযুক্ত হওয়ায় কোনো রাজ্য ওই পাঠ্যসূচি তাদের সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত করতে পারে, আবার নাও করতে পারে। ইতিহাস না পড়ে বিতর্কে জড়াবে না। সিলেবাস নিয়ে অযথা বিভাজনের রাজনীতি করা ঠিক নয়। মনে রাখতে হবে, শিক্ষার সঙ্গে কোনো আপোশ নয়।

—**সুবল সরদার,**
মগরাহাট, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

ফঃ ৩

বন্দর ও নগরের নাম সুরাট

গুজরাটের সুরাট নগরের কথা আমরা সকলে জানি। হিরে কাটা ও পালিশের নগর। ঐতিহ্যবাহী জনপদের কেন্দ্রটি আরব সাগরের নিকটবর্তী তাপ্তী নদীর দক্ষিণতটে অবস্থিত। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক বন্দর। এই বন্দরে একসঙ্গে বহু দেশের জাহাজ নোঙর করতে পারতো। এই শহরের প্রাচীন নাম সূর্যপুর। কথিত আছে, ১৫১৬ খ্রিস্টাব্দে এক ব্রাহ্মণ এই নামকরণ করেন। উল্লেখ্য, গুজরাটের সৌরাষ্ট্র ছিল সূর্য উপাসকদের ভূমি। তাই সূর্য উপাসকরা সৌর নামে পরিচিত। তাই সৌর থেকে নাম হয় সৌরাষ্ট্র। বৃহত্তর সৌরাষ্ট্রের অন্তর্গত ছিল আজকের সুরাট বন্দর বা নগর। খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর বিখ্যাত ভুগোলবিদ টলেমি তাঁর গ্রন্থে সুরাষ্ট্রিনি নামের বন্দরের কথা উল্লেখ করেছেন। এই বন্দর হচ্ছে আধুনিক সুরাট। এটা সহজেই বোঝা যায়, সৌরাষ্ট্রের বন্দর অর্থে সুরাষ্ট্রিনি নাম এসেছে। অর্থাৎ সুরাষ্ট্রিনি নামের মূলে রয়েছে সৌরাষ্ট্র নামটি। আবার সৌরাষ্ট্র নামটি এসেছে সৌর শব্দ থেকে। সুরাষ্ট্রিনি নামের সম্ভাব্য বিবর্তন নিম্নভাবে লেখা যায়। সুরাষ্ট্রিনি---সুরাষ্ট্রনি—সুরাষ্ট্র—সুরাট—সুরত উল্লেখ্য, গুজরাটি ও হিন্দি ভাষায় সুরাটকে 'সুরত' এবং ইংরেজিতে Surat বলা হয়। পরিশেষে বলতে হয়, সুরাট বা সুরত নামের মূলে রয়েছে সৌরাষ্ট্র আর সৌরাষ্ট্রের মূলে রয়েছে সূর্য নামটি।

—**রাজকুমার জাজোদিয়া,**
কালিয়াগঞ্জ।

নেহরু নন গান্ধীজী

সুশান্ত মজুমদার লিখেছেন : প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু মন্ত্রীসভার প্রায় বিরুদ্ধে গিয়ে কয়েকশো কোটি টাকার সাহায্য পাঠিয়ে তৎকালীন জিন্না সরকারকে বাঁচিয়েছিলেন। ('প্রচ্ছদ নিবন্ধ'; স্বস্তিকা, ৬.২.২০২৩)। ভুল তথ্য। (১) কয়েকশো কোটি নয়, টাকাটা ছিল ৫৫ কোটি। (২) জওহরলাল নেহরু নন, ওই ৫৫ কোটি পাকিস্তানকে দেওয়ার জন্য দায়ী ছিলেন মহাত্মা গান্ধী। কাশ্মীরে পাক হানাদারির পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্ত ছিল, পাকিস্তানকে টাকা দেওয়া হবে না। ভারত সরকারের ওই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে 'জাতির বিবেক' সেজে গান্ধী আমরণ অনশন শুরু করে দিয়েছিলেন এবং ভারত সরকারকে বাধ্য করেছিলেন মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে ৫৫ কোটি টাকা পাকিস্তানকে দিতে। আচার্য জে.বি. কৃপালনীর 'Gandhi, His Life and Thought' সূত্রে (পৃ. ৩০১) আমরা জানি '...even though a greater amount was to be paid by Pakisthan...'। গান্ধীজীর বক্তব্য ছিল : ভারতকে নিজেদের চুক্তি মেনে চলা উচিত। ভারত ৫৫ কোটি টাকা না দেওয়া মানে ভারতের নৈতিক বল নষ্ট হওয়া। বলা বাহুল্য, পাকিস্তানের কাছ থেকে ভারতের পাওনা তিনশো কোটি টাকা আজও অনাদায়ী রয়ে গিয়েছে। অতঃপর একটি কথা। ভ্রান্তি বা বিকৃতি যাই বলা যাক না কেন, উপরোক্ত ধরনের তথ্য-বিচ্যুতি স্বস্তিকাতে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বিরল নয়। স্বস্তিকা কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে একটু মনোযোগী হলে খুবই ভালো হয়।

—**বিমলেন্দু ঘোষ,**
কলকাতা-৬০।

তালিবান সেবায় ভারতীয় গম

বেশিরভাগ সংবাদপত্রে ফলাও করে ছাপা হয়েছে সম্প্রতি চরম সংকটে ভোগা তালিবান শাসিত আফগানিস্তানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০ হাজার মেট্রিক টন গম পাঠাচ্ছে। এছাড়াও ভারত সরকার সেখানকার পার্লামেন্ট হাউস এবং ৩০০ শয্যা বিশিষ্ট একটি আধুনিক হাসপাতাল তৈরি করে দিচ্ছেন। এই ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে বাজপেয়ীজীর আমলে নেপাল বিমানবন্দর থেকে একটি যাত্রীবাহী বিমান তালিবানরা অপরহরণ করে নিয়ে যায়, সেই বিমান উদ্ধার করতে কাবুল সরকার কোনো সাহায্যই করেনি। বাধ্য হয়ে ভারত সরকার জেলবন্দি কয়েকজন উগ্রপন্থীকে মুক্তি দিয়ে বিমানটি মুক্ত করেন। ওই হাসপাতালটি তৈরি হলে তালিবানরা কাশ্মীরি পণ্ডিতদের হত্যা করতে গিয়ে আহত হলে কিংবা সেনাবাহিনীর গুলিতে আহত হলে ওই হাসপাতালে চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে আবার ভারতের ওপর হামলা চালাবে। অনেকে বলছেন, মোদীজী মুসলমান ভোট পাওয়ার জন্য নানা চিন্তা ভাবনা করছেন। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার এক রিপোর্টে প্রকাশ, পার্লামেন্টে ৭০টি আসনের ফলাফল নাকি নির্ভর করে মুসলমান ভোটারদের ওপর। আমি হলফ করে বলতে পারি পাকিস্তানপন্থী মুসলমানরা বিজেপিকে ভোট দেবে না।

আমাদের ১৮ হাজার সেনার প্রাণের বিনিময়ে ভারত বাংলাদেশকে স্বাধীন করে দিয়েছে। মুজিবুর রহমান পাক জেল থেকে মুক্তি পেয়েই বলেছিলেন, বাংলাদেশ দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলমান রাষ্ট্র, এছাড়াও তিনি অর্গানাইজেশন অব মুসলিম কোঅপারেশন (যার সদস্য ৫৯টি মুসলমান দেশ)-এর সদস্যপদ গ্রহণ করেছেন। যে ও.আই.সি. বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধিতা করে পাকিস্তানকে সমর্থন করেছিল। এছাড়াও এখনও বাংলাদেশের অধিকাংশ মুসলমান একজন রাজাকারকে আপন মনে করে, কারণ সে হয়তো মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছিল। বাংলাদেশ যখন স্বাধীন হয় তখন সেখানে হিন্দুর সংখ্যা ছিল ২২ শতাংশ বর্তমানে তা দাঁড়িয়েছে ৮ শতাংশ।

মাওলানা ভাসানি ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। পাকসেনা তার বাড়িঘর কামানের গোলায় গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। দেশ স্বাধীন হলে তিনি দেশে ফিরলে ভারত সরকার তার বাড়িঘর পুনর্নির্মাণ করে দেয়। তাছাড়া ইন্দিরা গান্ধীর নিকট আবেদন করলে তাকে ৫০ লক্ষ টাকা অনুদান দেওয়া হয়। সেই ভাসানি ১৯৭৬ সালে লক্ষাধিক বাংলাদেশি মুসলমানকে সঙ্গে নিয়ে ফরাক্কা বাঁধ গুঁড়িয়ে দিতে অগ্রসর হয়েছিল। ভারতের সীমান্ত রক্ষীবাহিনী তাদের সীমান্তেই আটকে দেয়। তাই মোদীজীকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই সাপকে যতই দুধকলা ভোগ দেওয়া হোক না কেন সে অমৃত নয়, গরলই উৎপন্ন করবে।

—**রবীন্দ্রনাথ দত্ত,** কলকাতা-৬৪।

সন্তানকে সংস্কারিত করার দায়িত্ব মায়েদের

সুতপা বসাক ভড়

ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, দেশ এবং সমগ্র বিশ্ব এক অদ্ভুত পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে চলছে। সাহিত্য, চলচ্চিত্রের মাধ্যমে ব্যাপক হারে উপরোক্ত প্রতিটি স্তরে ধারাবাহিক ভাবে, সুচতুরতার সঙ্গে চলছে মগজধোলাই। গল্পে আমরা দেখতে পাই হিন্দু মেয়ের প্রেম মুসলমান যুবকের সঙ্গে। সেখানে মেয়েটির পরিবার পরিজনকে শত্রুভাবাপন্ন করে উপস্থাপিত করা হয়ে থাকে। অপরদিকে ছেলেটিকে খুবই উদার, সরল, সচ্চরিত্র, শিক্ষিত এবং সাধারণত তার বাড়ির লোকজনকে সাজানো হয় নিরীহ, অত্যাচারিত, এককথায় সবদিক থেকে খুবই ভালোমানুষরূপে। চলচ্চিত্রেও আমরা এরই প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই। দীর্ঘ সময় ধরে চলচ্চিত্র শিল্প এক বিশেষ সম্প্রদায়ের লোকেদের কালো টাকায় চলছে। তাদের অঙ্গুলিহেলনে রচিত হয় চিত্রনাট্য। সেখানে হিন্দু পরিবারটিকে একরোখা, গোঁড়া দেখিয়ে, যত ভালো ভালো গুণ সব মুসলমান চরিত্রগুলিতে ঢেলে দেওয়া হয়। চলচ্চিত্রকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য আনুষঙ্গিক কদর্যতাও আমাদের সহিষ্ণুতার সুযোগ নিয়েই করে তোলে তারা (উদাহরণস্বরূপ, পাঠান)। আবার কাশ্মীর ফাইলসের মতো বাস্তবধর্মী চলচ্চিত্রের বিরোধিতাও চলে। কাশ্মীর পণ্ডিতদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, কীভাবে মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই সর্বস্বান্ত হয়ে তাঁরা নিজেদের বাড়ি-ঘর সব ছেড়ে কেবলমাত্র নিজ ধর্মরক্ষার্থে বিতাড়িত হতে বাধ্য হয়েছিলেন। একদা হিন্দু প্রধান কাশ্মীরে অত্যাচারিত, নিহত, ধর্ষিত, বিতাড়িত হয়েছেন হিন্দুরা, যা প্রকৃতপক্ষে চলচ্চিত্রে প্রদর্শিত ঘটনাবলীর থেকেও বীভৎস, অসহনীয়। এর থেকে আমরা কী শিক্ষা পেলাম?

এইসব ঘটনাবলী একদিনে ঘটে না। দীর্ঘদিন ধরে সুচারু পরিকল্পনা করে আমাদের নিশ্চিহ্ন করতে চায় তারা। অতি সম্প্রতি রাউরকেল্লার মতো আপাতনিরীহ শহরের ঘটনা--- সিনেমার প্রভাবে একটি হিন্দু কিশোরী তার মুসলমান প্রেমিকের প্রেমে হাবুডুবু খায়। ছেলেটির পক্ষ থেকে শর্ত হলো, মেয়েটিকে ইসলাম গ্রহণ করতে হবে। মেয়েটিও প্রস্তুত। তার মা-বাবা এটি মেনে নিতে পারছেন না। তাঁরা মেয়েকে নিষেধ করছেন ছেলেটির সঙ্গে মেলামেশা করতে। কিন্তু সব নিষ্ফলে যায়। মেয়েটি তিনবার ওদের সঙ্গে মসজিদে যায়, স্বেচ্ছায় ধর্মান্তরিত হবার জন্য। কিন্তু মা-বাবার ফোন আসায় ওই অনুষ্ঠানে বাধা পড়ে। মৌলবি মেয়েটিকে কিছু কাগজ দেয় এবং বলে যে ওগুলি পাঠ

করলেই সে ধর্মান্তরিত হয়ে যাবে। তার মা-বাবা বাড়িঘর ছেড়ে মেয়েকে নিয়ে দূরে চলে গেছে। কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেছে।

তাদের উদ্দেশ্য হলো হিন্দু মায়ের কোলে জেহাদি মুসলমানের জন্ম দিয়ে সংখ্যা বৃদ্ধি করা। একটু ভাবলে দেখা যাবে, তারা ওদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য কী সাংঘাতিক পরিকল্পনা করেছে! এখন আমাদের করণীয় কী? সন্তানদের মধ্যে বাল্যকাল থেকে নিজ ধর্ম সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাভাব জন্মাতে হবে। উদাহরণরূপে প্রস্তুত হতে হবে প্রত্যেক মাকে। আমাদের দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক হলো মাতৃশক্তি এবং এই মাতৃশক্তির হাতে গড়া হচ্ছে আমাদের আগামী প্রজন্ম। আমাদের সন্তানদের কেবলমাত্র বিদ্যালয়ের বাঁধাধরা পড়াশোনা ছাড়াও অবসর সময়ে রামায়ণ-মহাভারত পড়াতে হবে। গীতা সম্বন্ধে বাড়িতে আলোচনা করতে হবে। আমাদের ইতিহাস সংক্রান্ত বই, টিভিতে সম্প্রচারিত ধারাবাহিকগুলি দেখতে হবে তাদের সঙ্গে বসে। সন্তান একদিনে কুপথে যায় না।

মেয়ের সঙ্গে সহজভাবে মেলামেশা করে সংস্কারিত করতে হবে। সন্তান সংস্কারিত না হলে বড়ো বড়ো ডিগ্রি, অধিক উপার্জন— সব ব্যর্থ। এর কুফল ভুগবেন সবার আগে সেই সন্তানের জননী। সুতরাং আমরা সচেষ্ট হব, আমাদের সন্তানদের সংস্কারিত করতে, সচেতন করতে। ব্যক্তি সংস্কারিত হলে স্বাভাবিকভাবেই সংস্কারিত হবে পরিবার, সমাজ, দেশ। আসুন আমরা এই শুভকাজে সংকল্পবদ্ধ হই। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "জননীগণ উন্নত হইলে তাঁহাদের কৃতী সন্তানবর্গের মহৎ কীর্তি দেশের মুখ উজ্জ্বল করিতে পারিবে এবং তখনই ঘটিবে দেশে সংস্কৃতি, পরাক্রম, জ্ঞান ও ভক্তির পুনরুজ্জীবন।" □

অস্টিওপোরোসিসে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

দেশে মোট জনসংখ্যার তিন শতাংশই অস্টিওপোরোসিস বা হাড় ক্ষয় রোগে আক্রান্ত এবং এই রোগে আক্রান্তের বেশিরভাগই হচ্ছেন নারী। চিকিৎসকরা বলছেন, এই রোগে আক্রান্তদের অনেকেই তাদের রোগ সম্পর্কে জানেন না। আক্রান্তদের সময়মতো সঠিক চিকিৎসা না হলে ৬ মাসেই মৃত্যু ঘটতে পারে। ৫০ বছর বয়সি যারা এই রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন তাদের প্রতি দশজনের ৯ জনই নারী। তবে ৭০ বছর বয়সিদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা কিছুটা বেড়ে সাধারণত এই অনুপাত হয় ৬ : ৪ বা ৭ : ৩। চিকিৎসকরা বলছেন, তাদের ধারণা আগামী ৫ বছরে নন-কমিউনিকেবল যেসব রোগে মানুষ বেশি আক্রান্ত হয় তার মধ্যে শীর্ষ পাঁচে এই হাড় ক্ষয় রোগ উঠে আসবে। হাড় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেশি হবে বলে ধারণা। মানুষের শরীরের হাড়ের একটি গঠন প্রক্রিয়া আছে। জন্মের পর থেকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত হাড় নানাভাবে পরিপক্ব হতে থাকে। এরপর আবার ঘনত্ব কমে হাড় পাতলা হতে শুরু করে। হাড়ের ঘনত্ব যখন কমে যায় তখনই সেটা রোগ, আর এই নামই হাড় ক্ষয় রোগ।

এই রোগে আক্রান্ত হলে হাড়ের ঘনত্ব কমে হাড় ছিদ্রযুক্ত, দুর্বল এমনকী ভেঙেও যেতে পারে। সঠিক সময়ে এর প্রতিরোধ বা চিকিৎসা না করলে একান্ত ব্যক্তিগত কাজকর্ম এবং অনেক ক্ষেত্রে স্বাভাবিক হাঁটাচলা করাও প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। মূলত হাড়ের স্ক্যান করে চিকিৎসকরা বুঝতে পারেন যে এর ঘনত্ব কতটা কমেছে এবং সে অনুযায়ী তার চিকিৎসা দিয়ে থাকেন। সাধারণত একটি নির্দিষ্ট বয়সের পরে স্বাভাবিক নিয়মেই মানুষের হাড় ক্ষয় হয়ে থাকে। মানুষের শরীরের এই ধরনের পরিবর্তনের সঙ্গে হরমোনের প্রভাব থাকে। আর নারীদের শরীরে হরমোন খুব তাড়াতাড়ি কমে যায়। মহিলাদের ক্ষেত্রে এস্ট্রোজেন এবং পুরুষদের ক্ষেত্রে টেস্টোস্টেরন হরমোনের অভাব দেখা দেয়। বিশেষ করে মেয়েদের মাসিক বন্ধ হলে বা মেনোপোজের পর এটি বেশি হয়। হরমোন কমে গেলে শরীর থেকে দ্রুত ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন ডি বের হয়ে যায়। ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন ডি কমে গেলে তখন শরীর আর হাড় গঠন করতে পারে না। ফলে শুরু হয় হাড় ক্ষয়।

এছাড়া যারা ক্যান্সার, রক্তরোগ, অপুষ্টিজনিত রোগ, কিডনি রোগে আক্রান্ত, তাদের হাড় ক্ষয় রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি অনেকগুণ বেড়ে যায়। এর বাইরে নানা রোগের চিকিৎসার জন্য যারা দীর্ঘদিন ধরে স্টেরয়েড সেবন করে তাদের হাড়েরও ঘনত্ব কমে গিয়ে হাড় ক্ষয় রোগ হতে পারে। হাড় ক্ষয় একটি নীরব ঘাতক রোগ। অনেকেই বুঝতে পারেন না যে তিনি এই রোগে আক্রান্ত হয়ে গেছেন। চিকিৎসকরা বলছেন, সাধারণত মানুষ পিঠের ব্যথা নিয়েই তাদের কাছে আসেন। এছাড়া কোমর ব্যথাও অনেকের মধ্যে দেখা যায়। এই রোগে আক্রান্ত হলে সাধারণত যতটুকু আঘাতে একজন ব্যক্তির হাড় ভাঙার কথা, তার মাত্র এক পঞ্চমাংশ আঘাতেই হাড় ভেঙে যায়। আর মেরুদণ্ডের হাড়ের ক্ষয় হলে মানুষ একটা পর্যায়ে গিয়ে কুঁজো হয়ে যায়। মেরুদণ্ড ছাড়াও কোমর, হাজের কবজি, পায়ের কুচকির হাড়ের ক্ষয় হওয়ার প্রবণতা অনেক বেশি। আসলে যেসব হাড় শরীরের ওজন বহন করে সেগুলোই ক্ষয় হয় বা ভেঙে যায় এই রোগটির কারণে। যার ফলে চিকিৎসার চেয়ে রোগটি প্রতিরোধ করাই উত্তম। এজন্য সুষম খাবার বিশেষ করে ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন ডি সমৃদ্ধ খাবার খাওয়ার অভ্যাস করতে হবে ছোটোবেলা থেকেই। আর শারীরিক পরিশ্রম ও রোদে যাওয়াটাও গুরুত্বপূর্ণ।

ফলে দুধ, দই, সবুজ শাকসবজি ও তাজা ফলমূল যেমন খেতে হবে তেমনি বাচ্চাদের বাইরে খেলাধুলার ব্যবস্থা করতে হবে। সুষম খাবার না পেলে আর খেলাধুলা না করলে বাচ্চাদের হাড়ের গঠন ঠিক মতো হয় না যা ভবিষ্যতের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। চিকিৎসকরা সাধারণত ক্যালসিয়ামের জন্য নিয়মিতভাবে মাছ, মাংস, ডিম, দুধ ও দুধজাতীয় খাবার খাওয়ার পাশাপাশি প্রতিদিন ১৫ থেকে ৩০ মিনিট সূর্যের আলোতে থাকার কথা বলেন। এছাড়া সামুদ্রিক মাছ খাওয়া, ধুমপান ও মদ্যপান ত্যাগ করা এবং ডায়াবেটিস, লিভার, কিডনি রোগ থাকলে সেটিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। আর সতর্কতা হিসেবে বাড়িতে বাথরুমের পিচ্ছিলতা দূর করা, রাতে ঘরে মৃদু আলো জ্বালিয়ে রাখা এবং অন্ধকারে চলাফেরা না করার কথাও বলেন। পাশাপাশি এই রোগে যারা আক্রান্ত হন তাদের কোনোভাবেই অতিরিক্ত ওজন বহন না করার কথাও বলা হয়। কারণ, লক্ষণ ও মায়াজম নিয়ে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করলে এই রোগে সুফল পাওয়া যায়। □

দণ্ডি কাটার দাসখত!

রক্তিম দাশ

জনজাতি সমাজের পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মুর বিখ্যাত একটি কথা রয়েছে। তাতে তিনি বলেছিলেন, 'অল মেনা তামা:, রড মেনা তামা:, ধরম মেনা তামা: আম হ: মেনাম; অলেম আদলেরে, রডেম আমলেরে, ধরম এম আদলেরে, আম হম আদঃ।' অর্থাৎ বর্ণমালা, ভাষা, ধর্ম, থাকলে তুমিও আছ। আর বর্ণমালা, ভাষা, ধর্ম, হারিয়ে গেলে তুমিও হারিয়ে যাবে! একথাটা যেন আজ ক্রমশ সত্যি হয়ে যাচ্ছে। একদিকে রাজনৈতিক চাপ আর অন্যদিকে ধর্মান্তকরণের ধাক্কায় জনজাতি জনগোষ্ঠীর গৌরবান্বিত জাতিসত্ত্বা আজ বিপন্নের পথে। এই অরণ্যপ্রিয় সহজ সরল মানুষ আজ কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছে। খ্রিস্টান মিশনারিরা নানা প্রলোভন আর মিথ্যার গল্প শুনিয়ে সাঁওতালদের খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরকরণ করেছে। তাঁদের ভুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, তাঁরাও হাজার হাজার বছর ধরে চলে আসা ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের ধারক-বাহক। জনজাতি সমাজের সরলতার সুযোগ নিয়ে শিক্ষার নামে খ্রিস্টান মিশনারিরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শিশু বয়স থেকে মগজ ধোলাই করে তাঁদের ধর্মান্তরকরণ করে চলেছে। তাঁরা আজ ভুলতে বসেছেন তাঁদের বাপ-ঠাকুরদারা ছিলেন প্রকৃতির উপাসক।

পাশাপাশি শহুরে তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের পাল্লায় পড়ে জনজাতিরা শিখছেন, তাঁরা এই ভারতবর্ষের সন্তান হলেও তাঁদের ধর্ম স্বতন্ত্র! সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় সেই চিন্তা আরও প্রসারিত হচ্ছে। প্রবল গরমে নেতা-মন্ত্রীদের স্বাগত জানাতে জনজাতি মহিলা-পুরুষরা ধামসা-মাদল নিয়ে রাস্তায় নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কখনও সমাজ বদলের নামে জনজাতি সমাজকে দেশের বিরুদ্ধে উসকে দিয়ে কল্পিত বিপ্লবের স্বপ্ন দেখাচ্ছেন মাওবাদী নেতারা। আবার মুখ্যমন্ত্রী সগৌরবে হুল দিবস পালন করতে গিয়ে ইতিহাস বিস্মৃত হয়ে নাকি ইচ্ছাকৃত ভাবেই বীর সিধু-কানুর সঙ্গে 'ডহর'-এর পরিবারের খোঁজ করছেন! ভাবটা এমন দেখাচ্ছেন যেন জনজাতি সমাজকে তিনি বদলে দিয়েছেন। কলকাতার থিম পুজোয় পুরস্কারের লোভে জনজাতি সমাজের সংস্কৃতিকে তুলে ধরা হচ্ছে। কিন্তু তাঁদের উন্নয়ন কতটা হয়েছে এতে? প্রশ্নটা কেউ তুলছেন না। হ্যাঁ, এটা ঠিক স্বাধীন ভারতে তাঁরা ভোটাধিকার পেয়েছেন। কিন্তু নিজেদের কথাটা কী বলতে পারছেন? যখনই তাঁরা সচেতন হয়ে উঠে নিজেদের কথাটা বলার চেষ্টা করেছেন তখন ব্রিটিশ আমলের বর্বরতা তাঁদের ওপর নামিয়ে আনা হচ্ছে।

আজ জনজাতি মহিলারা শহরের রাস্তায় দণ্ডি কেটে দাসখত দিচ্ছেন! এর অর্থ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করছেন! কোন অপরাধ? বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন তাঁরা। স্বাধীন দেশের যে কোনো নাগরিকের যে কোনো দল করার অধিকার থাকলেও এটা তাঁদের ক্ষেত্রে খাটে না বলেই মনে করেছেন শাসকদল তৃণমূলের বালুরঘাটের নেত্রী প্রদীপ্তা চক্রবর্তী। তাই মার্চ মাসের প্রবল গরমে বালুরঘাট কোর্টের মোড় থেকে তৃণমূলের পার্টি অফিস পর্যন্ত শনকইর গ্রামের কয়েকজন জনজাতি মহিলাকে দণ্ডি কাটিয়ে ঘরওয়াপসি করা হয়। শুধু তাই নয়, কাজটা যে সঠিক হয়েছে তার জন্য সাফাই গেয়েছেন তৃণমূলের সাংসদ অপরূপা পোদ্দার। তাঁর সাফ কথা, 'দলের স্পষ্ট নির্দেশিকা রয়েছে ফিরতে হলে প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে। ২০২১ সালের পর যারা দলে ফিরেছেন নিজেদের ভুল বুঝে সকলেই প্রায়শ্চিত্ত করে ফিরেছেন। অনেকেই ন্যাড়া হয়েছে। তপনের ঘটনায় মহিলারা স্বেচ্ছায় প্রায়শ্চিত্ত করেছে।'

জনজাতি সমাজে দণ্ডি কাটার মতো কোনও ধর্মীয় রীতি নেই বলেই দাবি করছে আদিবাসী সংগঠনগুলি। তাঁরা একে 'মধ্যযুগীয় নাকখত' বলেই মনে করছেন। কিন্তু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যিনি মহিলা জনজাতি অন্তপ্রাণ! তিনি এখনও কিছু বলেননি। জেলা পুলিশ সুপার রাহুল দে জানিয়েছেন, সঠিক আইনে মামলা রুজু করেই ঘটনার তদন্ত করা হচ্ছে। মহিলাদের গোপন জবানবন্দিও আদলতের কাছে জানানো হয়েছে। দোষী কে বা কারা তা চিহ্নিত করার প্রক্রিয়া চলছে। রাজ্যের মহিলা কমিশনে নিন্দা জানিয়ে, ক্ষতিপূরণের আশ্বাস দিয়ে নিজেদের দায় সেরেছেন। ঘটনায় এফআইআর হলেও অভিযুক্তের নাম নেই কেন, উঠছে প্রশ্ন।

ভারতবর্ষের জনজাতি সমাজ সহজ। সরল আপাতদৃষ্টিতে তারা নিরীহ। অশান্তি থেকে সবসময় দূরে থাকার চেষ্টা করলেও নিজেদের জাতিসত্তায় আঘাত করলে তাঁরা শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে প্রতিবাদে শামিল হন। এই ঘটনায় পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের জনজাতি সমাজ অপমানিত হচ্ছে ঠিক তখন, যখন ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি পদে রয়েছেন জনজাতি জনগোষ্ঠী থেকে আসা দ্রৌপদী মুর্মু। যদিও তিনিও এর আগে অপমানিত হয়েছেন এই রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় থাকা দলটির মন্ত্রী অখিল গিরির কুবাক্যে। সে সময়ও প্রতিবাদের ঢেউ উঠেছিল জনজাতি সমাজে। এবারও উঠছে। কিন্তু শাসকদল যদি ভেবে থাকেন তাঁদের মৌনতায় বিষয়টি ধামাচাপা পড়ে যাবে তাহলে তাঁরা ভুল ভাবছেন। সাঁওতাল বিদ্রোহের সময় ব্রিটিশ সেনাপ্রধান মেজর জারভিস বলেছিলেন, 'আমরা যা করেছি তা যুদ্ধ নয়, গণহত্যা! আত্মসমর্পণ কাকে বলে সাঁওতালদের কাছে অজ্ঞাত।' এই অমোঘ সত্যটা যদি শাসকদল তাড়াতাড়ি বুঝতে পারে, তাহলে ভালো। নাহলে কী ঘটবে, সেটার ইতিহাস রয়েছে জঙ্গলমহলের প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসে। ■

তৃণমূল কংগ্রেসকে সর্বনাশা রাজনীতির ফল ভুগতে হবে

বিমল শঙ্কর নন্দ

গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় দলবদল কোনো বিরল বা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বরং ভারতের মতো দেশে তা অতি স্বাভাবিক এক ঘটনা। ভারতীয় রাজনীতিতে দলবদল নিয়ে বহু চর্চা হয়েছে। জনপ্রতিনিধিদের দলবদল আটকাতে নানা সাংবিধানিক ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়েছে। জনপ্রতিনিধিদের দলবদল নিয়ে যতটা চর্চা বা আলোচনা হয় নীচু স্তরের রাজনৈতিক কর্মীদের এক দল থেকে অন্য দলে যাওয়া নিয়ে ততটা হয় না। কিন্তু অতি সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় দলবদল এবং পুনরায় দলে ফিরিয়ে নেওয়াকে কেন্দ্র করে এমন কিছু কুৎসিত ঘটনা ঘটেছে যা শুধু এ রাজ্যে নয়, গোটা দেশে জোর বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। এই বিতর্ক বহুদিন চলতে থাকবে। কারণ এই ঘটনায় একটি রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রীদের হীন মানসিকতা সবার সামনে একেবারে স্পষ্ট হয়ে গেছে। একটি রাজনৈতিক দলকে নির্বাচনের মুখোমুখি হতেই হয়। আগামী নির্বাচনগুলিতে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে অনেক অস্বস্তিকর প্রশ্ন উঠবে এবং তাদের তার মুখোমুখি হতেই হবে।

ঘটনাটি ঘটেছে এই রাজ্যের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায়। গত ৬ এপ্রিল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তপন বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক বুধরাই টুডুর উপস্থিতিতে বিজেপির জেলা মহিলা মোর্চার নেতৃত্বে গোফানগর অঞ্চলের প্রায় ২০০ জন মহিলা এবং তাঁদের পরিবার তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগ দেন। তাঁদের মধ্যেই ছিলেন শনকইর গ্রামের বাসিন্দা মার্টিনা কিস্কু, শিউলি মার্ডি, ঠাকরান সোরেন ও মালতী মুর্মু। এই দলবদলের ঘটনায় বিচলিত তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্ব এই চারজন জনজাতি মহিলার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তাঁদের বুঝিয়ে বালুরঘাটে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে দক্ষিণ দিনাজপুরের মহিলা তৃণমূল জেলা সভাপতি প্রদীপ্তা চক্রবর্তীর নেতৃত্বে তাঁদের 'ঘরওয়াপসি' হয়। কিন্তু ঘরওয়াপসির আগে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার জন্য তাঁদের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়।

বালুরঘাট কোর্ট মোড় থেকে তৃণমূলের জেলা পার্টি অফিস পর্যন্ত প্রায় এক কিলোমিটার রাস্তা এই জনজাতি মহিলারা দণ্ডি কেটে আসেন। জনজাতি মহিলাদের দণ্ডি কাটার ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসতেই গোটা রাজ্য কিংবা বলা ভালো দেশ জুড়ে শোরগোল পড়ে গেছে। শুরু হয়েছে তীব্র বিতর্ক। এই ঘটনার জন্য যার দিকে আঙুল উঠছে সেই মহিলা তৃণমূল জেলা সভানেত্রী প্রদীপ্তা চক্রবর্তী সাফাই গেয়েছেন যে তপনের ১১ নম্বর গোফানগর অঞ্চলের সাধারণ মানুষকে ভুল বুঝিয়ে বিজেপি তাদের হাতে পতকা তুলে দিয়েছিল। এই মহিলারা নাকি ভুল বুঝতে পারেন এবং প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য পার্টি অফিসে এসে দলে ফিরে এসেছেন। প্রদীপ্তা চক্রবর্তী এই চার মহিলার তৃণমূল কংগ্রেসে যোগাদানের জন্য নিজে কৃতিত্বও নেন। আগামীদিনে তাঁদের হাত ধরে আরও অনেকেই

তৃণমূলে যোগ দেবেন বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেন। কিন্তু দণ্ডি কাটার ভিডিয়ো নিয়ে চাঞ্চল্য ছড়ানোর পরই তৃণমূল কংগ্রেস ড্যামেজ কন্ট্রোলে নেমে পড়ে। প্রদীপ্তা চক্রবর্তীকে মহিলা তৃণমূলের জেলা সভাপতির পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। সেই পদে নিয়ে আসা হয় জনজাতি মুখ স্নেহলতা হেমব্রমকে। দণ্ডি কাটা মহিলাদের একজনকে দিয়ে বিবৃতি দেওয়ানো হয় যে তাঁরা স্বেচ্ছায় দণ্ডি কেটেছেন।

কিন্তু জনজাতি মহিলাকে দণ্ডি কাটানো নিয়ে বিতর্ক থামছে না। কারণ এই ঘটনার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে। এই ঘটনা অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের মুখে ফেলে দিয়েছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসকে। প্রথমত, রাজ্যের শাসক তৃণমূল কংগ্রেস দাবি করে যে তারা রাজ্যে যে নতুন রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রচলন ঘটিয়েছে তা পূর্বতন কংগ্রেস বা বামেদের এলিটবাদী সংস্কৃতির চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। তৃণমূলের সর্বময় কর্ত্রী তথা সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অতি সাধারণ পরিবার থেকে উঠে এসে ক্ষমতার শীর্ষে পৌঁছেছেন। সাধারণ মানুষের ক্ষমতায়নের এ এক উজ্জ্বল উদাহরণ। কিন্তু একজন সাধারণ মানুষের নেত্রী যখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সেই রাজ্যের উপজাতি সম্প্রদায়ের চার মহিলাকে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার 'পাপ'-এর প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে অত্যন্ত অসম্মানজনকভাবে দণ্ডি কাটিয়ে দলে ফেরানো হলো কেন? অনেকেই প্রশ্ন করছেন এবং সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন করছেন যে তৃণমূল কংগ্রেস থেকে বিজেপিতে গিয়ে আবার তৃণমূলে ফিরে গেছেন মুকুল রায়, রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেক নেতা। তাদের তো কেউ দণ্ডি কেটে প্রায়শ্চিত্ত করতে বলেননি। বরং ফুলের মালা পরিয়ে সাদরে বরণ করে নেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়ত, তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা কর্তৃক জনজাতিদের অপমান এর আগেও ঘটেছে।

গত ২০২২-এর নভেম্বর মাসে নন্দীগ্রামে এক সভায় তৃণমূলের অনেক নেতা-মন্ত্রীর সামনে রাজ্যের কারা দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর বাহ্যিক রূপ নিয়ে অত্যন্ত বিতর্কিত একটি মন্তব্য করেন। অখিল গিরির মন্তব্য ছিল 'আমরা রূপের বিচার করি না, তোমার রাষ্ট্রপতির চেয়ারকে আমরা সম্মান করি। কিন্তু তোমার রাষ্ট্রপতিকে কেমন দেখতে বাবা?' অখিল গিরির মন্তব্য নিয়ে তীব্র বিতর্ক শুরু হওয়ার পর তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব অখিল গিরির মন্তব্য থেকে নিজেদের দূরত্ব তৈরি করতে সচেষ্ট হন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী নিজে তাঁর মন্ত্রীসভার এক সদস্যের এহেন মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চান। মন্ত্রী নিজেও বলেন মন্তব্যের জন্য তিনি অনুতপ্ত। বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তাঁর তীব্র সমালোচনা করায় তিনি নাকি দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ভারতের রাষ্ট্রপতি সম্পর্কে এমন মন্তব্য করে বসেছিলেন। লক্ষণীয় বিষয় হলো, ক্ষমা চাইলেও মুখ্যমন্ত্রী অখিল গিরিকে মন্ত্রীসভা থেকে সরানো হয়নি। তপনের দণ্ডিকাণ্ডে প্রদীপ্তা চক্রবর্তীকে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয়পদ থেকে সরিয়ে দিলেও এখনো তিনি বালুরঘাট পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান পদে বহাল আছেন। তাঁর বিরুদ্ধে কোনো আইনগত ব্যবস্থাও নেওয়া হয়নি। জাতীয় তফশিল উপজাতি কমিশন এই ঘটনা সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে শুরু করার পর দুজন ব্যক্তিকে লোকদেখানো গ্রেপ্তার করা হয়েছে মাত্র।

ভারতের রাষ্ট্রপতি সম্পর্কে অখিল গিরির মন্তব্য হোক কিংবা দক্ষিণ দিনাজপুরের তপনে তৃণমূলের স্থানীয় মহিলা নেত্রী প্রদীপ্তা চক্রবর্তীর উদ্যোগে জনজাতি মহিলাদের দণ্ডি কাটিয়ে তৃণমূল দলে ঘরওয়াপসি' করানো হোক, সব ঘটনাকেই তৃণমূল কংগ্রেস নেতাদের রাজনৈতিক মনোভাব এবং পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে আলোচনা করা যেতে পারে। তৃণমূল কংগ্রেস আগাপাশতলা একটি ক্ষমতাকেন্দ্রিক দল। দলের সদস্যদের ঐক্যবদ্ধ রাখার জন্য যে মতাদর্শগত ভিত্তি প্রয়োজন, এই দলের সেটা নেই। মতাদর্শ না থাকলে এবং ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতি প্রাধান্য পেলে দুর্নীতি আসবেই। পশ্চিমবঙ্গের শাসক দলের ক্ষেত্রে সেটাই ঘটেছে। তৃণমূল কংগ্রেসের বিভিন্ন স্তরের নেতাদের দুর্নীতি এখন গোটা দেশে মুখরোচক আলোচনার বিষয়বস্তু। তৃণমূলের নেতা, জনপ্রতিনিধিদের অনেকের বিরুদ্ধে চাকরি বিক্রির অভিযোগ উঠেছে। তদন্তের আওতায় এসে কেউ শ্রীঘরে গেছেন, কেউ শ্রীঘরে যাওয়ার দিন গুনছেন। যোগ্য চাকরিপ্রার্থীরা হকের চাকরির দাবিতে বছরের পর বছর রাস্তায় বসে আছেন। দলটা চারিদিক থেকে যতবেশি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে ততবেশি দলের সংগঠনে ভাঙন রুখতে হিংস্র আচরণ করছে।

তপনে জনজাতি মহিলাদের দিয়ে দণ্ডি কাটানো আর কিছু নয়, সবার কাছে একটা বার্তা দেওয়া যে বিজেপিতে যাওয়ার ফল কী হতে পারে। ২০২১ সালের ২ মে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর বিজেপি কর্মীদের ওপর যে ভয়াবহ অত্যাচার নামিয়ে আনা হয়েছিল সেটা ছিল এক ভয়ংকর বার্তা। তৃণমূলের কুশাসনে মানুষ আবার বিজেপিমুখী হতেই এই ধরনের কাজ শুরু করেছে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে উপজাতি সমাজের সম্মানের চেয়ে ভোটের রাজনীতি যে বেশি গুরুত্বপূর্ণ তার প্রমাণ হলো ভারতের রাষ্ট্রপতি সম্পর্কে কুৎসিত মন্তব্য করেও মন্ত্রী অখিল গিরি স্বপদে বহাল থেকে গেছেন। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী অখিল গিরির মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চেয়েছেন। কিন্তু তাকে মন্ত্রীপদ থেকে সরাননি। কারণ অখিল গিরি পূর্বমেদিনীপুরের এক প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা। তপনের দণ্ডিকাণ্ডে যার দিকে আঙুল উঠেছে সেই প্রদীপ্তা চক্রবর্তীও বালুরঘাটের প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা প্রাক্তন কারামন্ত্রী শংকর চক্রবর্তীর পুত্রবধূ। এক সময় দক্ষিণ দিনাজপুরের অন্যান্য অঞ্চলের মতো তপন অঞ্চলেও ছিল আরএসপি দলের একচ্ছত্র প্রাধান্য। ২০১৩-এর পঞ্চায়েত নির্বাচনে থেকে এই অঞ্চলের দখল তৃণমূল কংগ্রেসের হাতে চলে যায়। কিন্তু ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে দেখা যায় এই অঞ্চলের রাজনৈতিক ছবিটা বদলাচ্ছে। তৃণমূল কংগ্রেসের সীমাহীন দুর্নীতি দেখে ক্ষুব্ধ মানুষজন ঘাসফুল ছেড়ে পদ্মফুলের দিকে ঝুঁকতে শুরু করেছেন। গত বিধানসভায় তার প্রভাব পড়েছে। শোনা যাচ্ছে এবারের পঞ্চায়েত ভোটে গোফানগর অঞ্চল নিজেদের দখলে রাখতে প্রদীপ্তাকেই দায়িত্ব দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। এরপর তিনি তাঁর নিজের রাজনৈতিক নকশা তৈরি করেন। জনজাতি মহিলাদের দিয়ে দণ্ডি কাটানো সেই নকশারই বাস্তবায়ন। বিরোধীদের বাগে আনতে ক্ষমতা প্রয়োগই হলো তৃণমূলের অঘোষিত নীতি। প্রদীপ্তা সেই নীতির প্রয়োগ ঘটিয়েছেন মাত্র। প্রদীপ্তাকে বালুরঘাট পুরসভার ভাইস চেয়ারপার্সনের পদ থেকেও যদি সরানো হয় বা তাঁর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয় তবে তৃণমূল কংগ্রেসের সাংগঠনিক কাঠামো এবং কার্যকলাপের ওপর তাঁর প্রভাব পড়বে, তৃণমূল কংগ্রেস সেই ঝুঁকি নেবে না। জনজাতি সমাজের সম্মানের চেয়ে নিজেদের রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং সংগঠনের ভবিষ্যৎ নিয়ে তৃণমূল

অনেক বেশি চিন্তিত।

তৃণমূল কংগ্রেস চাইছে এই ঘটনা যাতে মানুষ দ্রুত ভুলে যায়। কিন্তু সত্যিটা হলো এই ঘটনার অভিঘাত নিয়ে দল যথেষ্টই উদ্বেগে। ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে, দলের জনজাতি মোর্চার উদ্যোগে গোটা রাজ্যে এই ঘটনার প্রতিবাদে আন্দোলন শুরু হয়েছে। বালুরঘাটের সাংসদ অধ্যাপক সুকান্ত মজুমদার এর প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন। এ ব্যাপারে কেন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। প্রতিবাদ জানিয়েছেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, 'যে সময় দেশের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু অসমের তেজপুর এয়ারফোর্স স্টেশনে সুখোই ৩০ বিমানে উঠছেন, সেই সময় চার জনজাতি মহিলাকে বিজেপিতে যোগদানের অভিযোগে দণ্ডি কাটানো হয়েছে।' প্রবল ক্ষোভ প্রকাশ করেছে জনজাতিদের বিভিন্ন সংগঠন। বিভিন্ন স্থানে তাঁরাও আন্দোলন শুরু করেছেন। জনজাতিদের বক্তব্য, বিজেপিতে যোগ দেওয়াকে পাপ হিসেবে চিহ্নিত করে চার জনজাতি মহিলাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে দণ্ডি কাটার নিদান দেওয়ার ঔদ্ধত্য স্থানীয় পর্যায়ের তৃণমূল নেতাদের হয় কী করে? তৃণমূল কংগ্রেসের তথাকথিত উন্নয়নের ভাবনার সঙ্গে এই ঘটনাকে কোনো ভাবেই মেলানো যায় না। ক্ষমতা ধরে রাখতে মানুষের মনে সন্ত্রাস তৈরির চেষ্টা হিসেবেই এই ঘটনাকে চিহ্নিত করা হচ্ছে।

ভারতীয় রাজনীতিতে জনজাতিদের আর প্রান্তিক সমাজের মানুষ বলে মনে করা হয় না। তারা এখন জাতীয় রাজনীতি এবং সমাজের মূল স্রোতে এসে গেছেন। যেখানে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বা অস্ট্রেলিয়ার মতো পরিণত গণতান্ত্রিক দেশের প্রাচীন উপজাতিদের কাউকে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদে বসাতে পারেনি, ভারত তা করে দেখিয়েছেন এক গরিব ও উপজাতি সম্প্রদায়ের মহিলাকে রাষ্ট্রপ্রধান পদে বসিয়ে। এই ঘটনা আরও লক্ষ লক্ষ উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষকে সামনে এগিয়ে চলার প্রেরণা জুগিয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস তার ক্ষমতাসর্বস্ব রাজনীতি দিয়ে জনজাতি সম্প্রদায়ের মনোভাব বুঝতে পারছে না। এ রাজ্যের জনজাতিরাও সুমুখপানে এগোতে চাইছেন। তৃণমূলের নেতারা দক্ষিণ দিনাজপুরে উপজাতি মহিলাদের বিজেপিতে যোগ দেওয়ার প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে দণ্ডি কাটতে বাধ্য করে কার্যত নাকখত দেওয়ালেন। এর রাজনৈতিক প্রতিফল তাদের ভোগ করতেই হবে। এ রাজ্যে তপশিলি উপজাতি অধ্যুষিত আসন ৬৮টি।

২০১১-এর জনগণনা অনুযায়ী এরাজ্যে তপশিলি উপজাতি মানুষের শতকরা হার মোট জনসংখ্যার ৫.৮ শতাংশ আর তপশিলি জাতির অন্তর্ভুক্ত মানুষের শতকরা হার ২৩.৫১ শতাংশ। তাঁদের উন্নয়ন না হলে কোনো উন্নয়ন প্রক্রিয়া সফল হবে না। এদের সম্মান দিতে হবে। তৃণমূল কংগ্রেস এদের অসম্মান করেছে। তার ফল এই দলকে পেতেই হবে।

> **এ রাজ্যে তপশিলি উপজাতি অধ্যুষিত আসন ৬৮টি। ২০১১-এর জনগণনা অনুযায়ী এরাজ্যে তপশিলি উপজাতি মানুষের শতকরা হার মোট জনসংখ্যার ৫.৮ শতাংশ আর তপশিলি জাতির অন্তর্ভুক্ত মানুষের শতকরা হার ২৩.৫১ শতাংশ। তাঁদের উন্নয়ন না হলে কোনো উন্নয়ন প্রক্রিয়া সফল হবে না।**

ফঃ ৪

কেশব ভবনে স্বস্তিকা নববর্ষ সংখ্যার প্রকাশ অনুষ্ঠান

গত ৮ এপ্রিল স্বস্তিকা বাংলা নববর্ষ সংখ্যার প্রকাশ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হলো কেশব ভবনের সভাকক্ষে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইস্টার্ন জোনাল কালচারাল সেন্টারের অধিকর্তা আশিস গিরি। প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র সঙ্ঘচালক অজয় নন্দী। বক্তা হিসেবে ছিলেন বিশিষ্ট বিজনেস কনসালটেন্ট, লেখক এবং সমাজ- রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক দেবযানী ভট্টাচার্য্য। অনুষ্ঠানে স্বস্তিকা লেখক সম্মান প্রদান করা হয় কল্যাণী বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, বিশিষ্ট কৃষি বিজ্ঞানী ড. কল্যাণ চক্রবর্তীকে। স্বস্তিকার পূর্বতন সম্পাদক ড. বিজয় আঢ্য শ্রীচক্রবর্তীকে উত্তরীয় পরিয়ে, পুষ্পস্তবক,শাল, পঞ্চফল,মিষ্টি ও মানপত্র দিয়ে সম্মানিত করেন। মানপত্র পাঠ করেন স্বস্তিকার দীর্ঘদিনের লেখক সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্মানের প্রত্যুত্তরে শ্রীচক্রবর্তী বলেন, পঁচাত্তর বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত রাষ্ট্রবাদী পত্রিকা স্বস্তিকার পক্ষ থেকে লেখক হিসেবে যে সম্মাননা পেলাম তা আমার মায়ের স্নেহাশীর্বাদ। স্বস্তিকা সম্মান যেন একান্নবর্তী পরিবারে আমারই ভাই-বোনের মাঝে এক পঁচাত্তর বয়স্ক স্নেহদাত্রী মায়ের আশীর্বাদ, অপার ভালোবাসার প্রকাশ। নিজের ঘরেই নিজের সাফল্য উদ্‌যাপন। এই সম্মান আমি অসংখ্য সতীর্থ ও সহকর্মীদের উদ্দেশে উৎসর্গ করছি। বিগত বছরগুলিতে যাঁদের এই সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে তাও সকলের সঙ্গে আমিও লাভ করেছি। আগামীদিনেও যারা এই পুরস্কার পাবেন, প্রাপক হিসেবে অসংখ্য রাষ্ট্রবাদীর সঙ্গে তা আমিও ভাগ করে নেবো।

এবারের অনুষ্ঠানে বক্তব্যের বিষয় ছিল 'ভারতীয়ত্বের প্রেক্ষিতে বাঙ্গালিয়ানা'। বক্তা দেবযানী ভাট্টচার্য্য তাঁর বক্তব্যের পরতে পরতে ইতিহাস থেকে উদ্ধৃতি তুলে ধরে প্রতিষ্ঠা করেছেন, বাঙ্গালিয়ানা ও ভারতীয়ত্ব আলাদা কিছু নয়। রামায়ণ-মহাভারতের সময় থেকেই বাঙ্গালিয়ানা ভারতীয়ত্বেই সম্পৃক্ত রয়েছে। বঙ্গজননীই ভারত জননী হয়েছেন। দীর্ঘ চৌত্রিশ বছর কমিউনিস্টরা বাঙ্গালিকে এই বোধ থেকে বিচ্যুত করে রেখেছিল।

সভাপতির ভাষণে আশিস গিরি বলেন, বাঙ্গালিয়ানাকে হাইজ্যাক করার নানাবিধ চক্রান্ত চলছে, তার মধ্যে একটি হলো, বাংলা নববর্ষ বঙ্গাব্দকে আকবরের প্রবর্তিত বলে চালানোর অপচেষ্টা। হিন্দু বাঙ্গালিদের কাছ থেকে মহারাজা শশাঙ্ককে ভুলিয়ে দেবার ষড়যন্ত্রটি কমিউনিস্ট ও তথাকথিত প্রগতিশীলরা বেশ ভালোভাবেই করে চলেছে।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন স্বস্তিকার সহ সম্পাদক সুকেশচন্দ্র মণ্ডল এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। সংস্কার ভারতীর অখিল ভারতীয় কার্যকর্তা ভরত কুণ্ডুর কণ্ঠে বন্দেমাতরম গীতের পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা হয়।

সংস্কার ভারতীর নববর্ষ আবাহন উৎসব

সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের আয়োজনে গত ১৪ এপ্রিল কলকাতা সল্টলেকের EZCC-র পূর্বশ্রী প্রেক্ষাগৃহে নববর্ষ আবাহন উৎসব ও সাংস্কৃতিক দেওয়ালপঞ্জীর লোকার্পণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র সঙ্ঘচালক বিশিষ্ট আইনজীবী অজয় নন্দী, কলকাতা মহানগর সঙ্ঘচালক জয়ন্ত পাল, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ কাজী মাসুম আখতার, অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষ, বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ সায়ন ভট্টাচার্য, সংস্কার ভারতীর রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা সদস্য সুভাষ ভট্টাচার্য এবং সংস্কার ভারতীর অখিল ভারতীয় সম্পাদিকা শ্রীমতী নীলাঞ্জনা রায়। সর্বপ্রথমে সংস্কার ভারতীর শিল্পীদের দ্বারা পরিবেশিত হয় সংগঠনের ভাবসংগীত — 'সাধয়তি সংস্কার ভারতী ভারতে নবজীবনম...।' এরপর তনুশ্রী মল্লিকের পরিচালনায় পরিবেশিত হয় দুটি নববর্ষ আবাহন সংগীত— 'জয় হোক জয় হোক শান্তির জয় হোক' ও 'তোরা সব জয়ধ্বনি কর'।এরপর বিশিষ্ট অতিথিবর্গ প্রদীপ প্রজ্বলন এবং নটরাজ মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ করেন। দীপ প্রজ্বলন মন্ত্রে ছিলেন শ্রীমতী সোমা চক্রবর্তী। পরিচয় পর্ব ও অতিথি বরণের পর দেওয়াল পঞ্জীর লোকার্পণ করেন বিশিষ্ট অতিথিবর্গ। এবারের সাংস্কৃতিক দেওয়ালপঞ্জীর বিষয় ছিল বাঙ্গলার আলপনা। দেওয়ালপঞ্জীর বিষয় এবং নির্মাণ সম্পর্কে আলোকপাত করেন সংগঠনের সম্পাদিকা শ্রীমতী মহাশ্বেতা চক্রবর্তী। দেওয়ালপঞ্জীর তথ্য প্রদান করেছেন অধ্যাপক ড. কল্যাণ চক্রবর্তী। প্রচ্ছদকথা ও আলপনায় অধ্যাপক সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, শান্তিনিকেতন। চিত্রাঙ্কনে অধ্যাপক সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, জয়দেব বণিক, দীপক দাস, অরিত্র ঘোষদস্তিদার, কণাদ দাস, জয়দীপ ভকত, অরূপ দাস, ঋদ্ধি বণিক, সোমা হাজরা ও দেবপর্ণা চক্রবর্তী।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট সরোদ বাদক পণ্ডিত জয়দীপ ঘোষকে নটরাজ সম্মান প্রদান করা হয়। উত্তরীয় শাল, পঞ্চফল, মিষ্টি, মানপত্র ও নটরাজ মূর্তি দিয়ে সম্মানে ভূষিত করেন অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষ।

'বঙ্গাব্দের প্রবর্তক মহারাজা শশাঙ্ক' বিষয়ে আলোকপাত করেন শ্রীমতী নীলাঞ্জনা রায়। বঙ্গাব্দের ওপর ড. কল্যাণ চক্রবর্তী-রচিত 'জয় শশাঙ্ক' কবিতা পাঠ করেন শ্রীমতী লিপিকা চৌধুরী। কাজী মাসুম আখতার বাংলাভাষা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালিদের করণীয় বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। মহারাজা শশাঙ্কের বিষয়ে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষ। দেওয়ালপঞ্জী নির্মাতা শিল্পীদের সংবর্ধনা জানান মঞ্চস্থ অতিথিবর্গ। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, অনুষ্ঠান চলাকালীন কিশোর শিল্পী শীর্ষ আচার্য মহারাজা শশাঙ্কের একটি আবক্ষ মৃত্তিকা মূর্তি নির্মাণ করে ইতিহাস রচনা করলেন। তাকেও বিশেষভাবে সংবর্ধনা দেওয়া ও উৎসাহিত করা হয়। প্রেক্ষাগৃহ ভূঅলংকরণের দায়িত্বে ছিলেন জয়দেব বণিক। সহযোগী ছিলেন ঋত্বিক দেবনাথ, অরূপ দাস, প্রবীর তালুকদার, স্পন্দন মাহাত, সোমা হাজরা, অন্বেষা দেবনাথ ও রিম্পা পাল। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সংস্কার ভারতীর রাজ্য সম্পাদক তিলক সেনগুপ্ত এবং ধন্যবাদ জানান সুভাষ ভট্টাচার্য। সংস্কার ভারতীর কেন্দ্রীয় কার্যকর্তা ভরত কুণ্ডুর কণ্ঠে বন্দেমাতরম্ সংগীতের পর প্রথম পর্বের অনুষ্ঠান শেষ হয়।

দ্বিতীয় পর্বে পণ্ডিত জয়দীপ ঘোষের সরোদ বাদন সবাইকে মন্ত্রমুগ্ধ করে। □

শ্রীরামনবমী শোভাযাত্রায় আক্রমণের প্রতিবাদে স্মারকলিপি প্রদান

শ্রীরামনবমী শোভাযাত্রায় বিশেষ সম্প্রদায়ের দুষ্কৃতীদের আক্রমণের প্রতিবাদে এবং নির্দোষ রামভক্তদের গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে গত ১১ এপ্রিল হুগলি জেলা শ্রীরামনবমী উদ্‌যাপন সমিতির উদ্যোগে একটি শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদী শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। হুগলির পিপুলপাতি মোড়

থেকে জেলা শাসকের দপ্তর পর্যন্ত প্রতিবাদীরা জয় শ্রীরাম ধ্বনি-সহ পথ পরিক্রমা করেন। শেষে রামনবমীর ধর্মীয় শোভাযাত্রায় বর্বরোচিত আক্রমণের প্রতিবাদে এবং নির্দোষ রামভক্তদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে পাঁচজনের একটি প্রতিনিধি দল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে জেলা শাসকের মাধ্যমে এক স্মারকলিপি প্রদান করে। প্রতিনিধি দলে ছিলেন বীরেন পাল, বলরাম দাস রায়, সুনীল কুমার বাগ, আনন্দ মোহন দাস ও রামায়ণ গুপ্ত। এই প্রতিবাদী শোভাযাত্রা মানুষের মনে প্রভাব ফেলে বলে জানা যায়।

বহরমপুর বিশ্ব হিন্দু পরিষদ কার্যালয়ে আম্বেদকর জয়ন্তী উদ্‌যাপন

বহরমপুর বিশ্ব হিন্দু পরিষদ কার্যালয়ে সামাজিক সমরসতা অভিযানের পক্ষ থেকে সপ্তাহব্যাপী জন্মজয়ন্তী পালনের অঙ্গ হিসেবে গত ১৪ এপ্রিল উদ্‌যাপিত হলো ভারতরত্ন ড. বাবাসাহেব ভীমরাও রামজী আম্বেদকরের জন্মদিবস। প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সুচনা করেন পরিষদের সভাপতি । সহসভাপতি অ্যাডভোকেট সুপ্তি হালদার ড. আম্বেদকরের

জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধলেন। মুখ্য বক্তা হিসেবে ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ক্ষেত্রীয় সামাজিক সমরসতা প্রমুখ গৌতম সরকার। তিনি তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন বাবাসাহেব কী কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে জীবনে সফলতা লাভ করেন। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী তিনি সারাজীবন সামাজিক ভেদভাব দূর করার চেষ্টা করেন। তাঁকে নিয়ে যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা চলছে তা থেকে সতর্ক থাকার কথা বলেন শ্রীসরকার ।

বঙ্গীয় সনাতনী সংস্কৃতি পরিষদের উদ্যোগে গত ১৫ এপ্রিল বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস চত্বর থেকে বাঙ্গালিয়ানার স্তম্ভপুরুষ নরেন্দ্রাদিত্য শশাঙ্কর প্রতিকৃতি, বাঙ্গালির চিরায়ত সংস্কৃতির প্রতীক স্বস্তিক-চিহ্নিত ধ্বজ, লজ্জাগৌরী, আম্রপল্লব, মঙ্গলঘট, বরণডালা, চামর, পাখা-সহ ঢাক, শ্রীখোল, গৌড়ীয় নৃত্য, কীর্তন, বাউল, পটের গান ও কবিতা সহযোগে মঙ্গল শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মহারাজা শশাঙ্কের চিত্র সংবলিত বাংলা দেওয়াল পঞ্জিকা আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করা হয় এবং গৌড়ভূষণ সম্মানে ভূষিত করা হয় বিশিষ্ট সাংবাদিক রক্তিম দাসকে। অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন বঙ্গীয় সনাতনী সংস্কৃতি পরিষদের সম্পাদক প্রবীর ভাট্টাচার্য।

রামনবমী শোভাযাত্রায় জেহাদি তাণ্ডব ও পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার প্রতিবাদে কলকাতায় পদযাত্রা

গত ৩০ ও ৩১ মার্চ হাওড়ায় এবং ২ এপ্রিল হুগলি জেলার রিষড়ায় শ্রীরামনবমীর শান্তি পূর্ণ শোভাযাত্রার ওপর জেহাদি দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব এবং পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা ও পক্ষপাতমূলক আচরণের প্রতিবাদে গত ১৩ এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার প্রবুদ্ধ ব্যক্তিবর্গ এক পদযাত্রায় মিলিত হন। পদযাত্রা রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার পার্ক থেকে শুরু হয়ে ধর্মতলায় শেষ হয়। সাহিত্যিক, লেখক, আইনজীবী, অধ্যাপক, শিক্ষক, চিকিৎসক-সহ সমাজের সকল স্তরের প্রবুদ্ধ মানুষ এই পদযাত্রায় অংশ নিয়েছিলেন এবং প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিলেন।

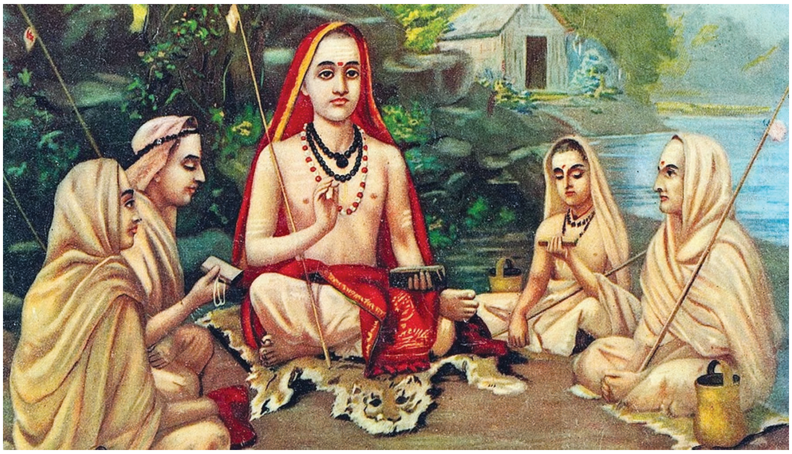

আচার্য শঙ্কর সনাতন ধর্মের প্রচার, প্রসার ও সংরক্ষণের জন্য ভারতের চার প্রান্তে চারটি মঠ স্থাপন করেন এবং চারজন প্রধান শিষ্যকে মঠাধ্যক্ষরূপে দায়িত্ব অর্পণ করেন।

আদর্শ সংগঠক এবং প্রকৃত ধর্মসংস্থাপক আচার্য শঙ্কর

ড. জয়ন্ত কুশারী

সনাতন ধর্মের অভিনব বার্তা হলো, ভগবান স্বয়ং আসেন। ভূমা থেকে ভূমিতে। মানব শিশুর মতো, সাধারণ মানুষের মতো ধরাধামে বিচরণ করেন। রেখে যান তাঁর অলৌকিক কীর্তি-কাহিনি। পৃথিবীর অন্য ভূখণ্ডে কোথাও তাঁদের ভগবান স্বয়ং আসেন না। আসেন তাঁর পুত্র কিংবা মিত্র অথবা তাঁর দূত। ভারতবর্ষের মাটিতে অবতীর্ণ হয়েছেন মর্যাদাপুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্র। এসেছেন লীলাপুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। এসেছেন ভগবান বুদ্ধ। এই দিব্য পরম্পরা অনুসারেই এসেছেন সনাতন ধর্মের সংগঠক এবং ধর্মসংস্থাপক আচার্য শঙ্কর।

সনাতন ধর্মের এক সংকটময় মুহূর্তে আবির্ভূত হয়েছিলেন আচার্য শঙ্কর। মাত্র বত্রিশ বছরের আয়ুষ্কাল নিয়ে তিনি এসেছিলেন এই ভারতভূমিতে। বিপুল জ্ঞানভাণ্ডার এবং তপঃশক্তি নিয়ে তীব্র গতিতে পরিক্রমণ করেছেন সমগ্র ভারতবর্ষ। অসংগঠিত সনাতন ধর্মকে বিধিবদ্ধভাবে সংগঠিত করেছেন তিনি। একজন আদর্শ সংগঠকের ভূমিকা পালন করেছেন। আবার সনাতন ধর্মের আবিলতা, পঙ্কিলতাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তিনি। একজন প্রকৃত ধর্মসংস্থাপক রূপে। ওই সময় আচার্য শঙ্কর অবতীর্ণ না হলে হয়তো সনাতন ধর্মই বিলুপ্ত হতো। আচার্য শঙ্করের এহেন অবদানের জন্যই আজ সনাতন ধর্ম আপন গরিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত।

আচার্য শঙ্কর যখন অবতীর্ণ হয়েছিলেন তখন ভারতের বৈদিক চিন্তাভাবনা আর বৈদিক পরম্পরা অত্যন্ত হীনবল হয়ে পড়েছিল। বেদ প্রধানত তিনটি কাণ্ডে বিভক্ত : (১) কর্মকাণ্ড, (২) উপাসনা বা ভক্তিকাণ্ড, (৩) জ্ঞানকাণ্ড। আধার অনুসারে মানুষ এই তিন কাণ্ডের শিক্ষাগুলিকে পৃথকভাবে জীবনে পালন করতে পারেন। আবার এই কাণ্ডগুলিকে একত্রিতভাবে অনুসরণ করে জীবন গঠনের দ্বারা মানুষ মুক্ত হয়ে যেতে পারেন। বেদ প্রকৃতপক্ষে সমন্বয়মুখী শাস্ত্র। কিন্তু তৎকালীন ভারতবর্ষে এই তিন কাণ্ডের অনুসারী পণ্ডিতবর্গ, সাধক ও ভক্তদের মধ্যে শুরু হয়ে যায় বিরোধ ও স্বমতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য বাগবিতণ্ডা ও প্রতিযোগিতা। বেদের এই তিন কাণ্ডকে অবলম্বন করেই ভারতে ষড় দর্শনের (বৈদেশিক, ন্যায়, সাংখ্য, যোগ, পূর্ব মীমাংসা ও উত্তর মীমাংসা) আবির্ভাব। তৎকালীন সমাজে এই ষড় দর্শনের অনুযায়ীগণের মধ্যেও রচিত হয় বিরোধের পরিবেশ। কর্মকাণ্ডের প্রচারক পণ্ডিতমণ্ডলী— কুমারিল ভট্ট, মণ্ডন মিশ্র, প্রভাকর প্রমুখ প্রমাণ করতে থাকেন বেদেরই মন্ত্র উদ্ধৃত করে যে, যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের দ্বারাই মানুষের লাভ হতে পারে পরম প্রাপ্তি— আর তা হলো অক্ষয় স্বর্গলাভ। ভক্তিকাণ্ডের ক্ষেত্রে প্রধান পঞ্চদেবতা (গণেশ, সূর্য, নারায়ণ, শিব ও শক্তি)-কে অবলম্বন করে যথাক্রমে গাণপত্য, সৌর, বৈষ্ণব, শৈব ও শাক্ত এই পাঁচটি সম্প্রদায় ছাড়াও মহালক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতিকে অবলম্বন করেও গড়ে ওঠে বহু সম্প্রদায়। যাঁদের বক্তব্য ছিল আমাদের এই দেবতাই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ এবং তাঁর উপাসনার দ্বারাই কেবলমাত্র মানুষ মুক্ত হতে পারে। ভাবলে আশ্চর্যান্বিত হতে হয় যে, এরকম বাহাত্তরটি সম্প্রদায় তখন দেশের মধ্যে গঠিত হয়েছিল। আর তাঁরা প্রত্যেকেই নিজের নিজের মতের প্রতিষ্ঠার জন্য বিবাদে রত ছিলেন। এছাড়া শাক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত তান্ত্রিকদের মধ্যে অনেকেই যেমন দক্ষিণ ভারতের ক্রকচ, অসমের অভিনব গুপ্ত প্রমুখ প্রবল তান্ত্রিক ক্ষমতাশালী সাধক হয়েও আভিচারাদি ক্রিয়ার দ্বারা, নিজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার কাজে যুক্ত হয়ে ধর্মের ক্ষতিসাধন করেছিলেন। এমনকী তখন কোথাও কোথাও নরবলিও প্রচলিত ছিল। ক্রকচের

তো নিজস্ব তান্ত্রিক সৈন্যবাহিনীও ছিল।

সনাতন ধর্মের মধ্যে যখন এই অবক্ষয়ের পরিবেশ রচিত হয়েছিল তখন আবার ভারতবর্ষে সনাতনধর্মের ভেতর থেকেই দুজন মহাপুরুষের আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে দুটি প্রভাবশালী সম্প্রদায়— বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্ম। বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক ভগবান বুদ্ধ এবং জৈনধর্মের প্রবর্তক ঋষভদেব। বুদ্ধদেব বেদ অবলম্বন করেই সাধনা করেছিলেন এবং তাঁর কথিত নির্বাণ আর বৈদিক শব্দ মোক্ষ একই বস্তু। তিনি ছিলেন অহিংসার পূজারি এবং প্রেমিক পুরুষ। তিনি পশুহিংসাত্মক যজ্ঞের থেকে মানুষকে বিরত করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি বেদের নিন্দা করেননি। কিন্তু তাঁর পরবর্তী সময়ের বৌদ্ধধর্মাচার্যদের জীবনে অনেক বিচ্যুতি ঘটে এবং তাঁরা বেদের নিন্দায় ব্রতী হন। আর মানুষ ক্রমশ বেদমার্গ থেকে সরে আসতে থাকে। সেক্ষেত্রে কুমারিল ভট্ট, মণ্ডন মিশ্র প্রমুখের ভূমিকা প্রশংসনীয় ছিল। কারণ তাঁরা সেই পটভূমিতে দাঁড়িয়ে বেদের কর্মকাণ্ডের প্রচারের মাধ্যমে জনসাধারণকে আবার বেদমুখী করার চেষ্টা করেছিলেন। জৈনধর্মের প্রচার প্রসার বৃদ্ধি পায় চব্বিশতম তীর্থঙ্কর মহাবীরের সময় থেকে। তিনিও ছিলেন ত্যাগী, ধ্যানপরায়ণ এবং অহিংসা পথের পথিক। এই দুটি ধর্মের প্রচারের ফলে বেদভিত্তিক সনাতন ধর্মের প্রচার ও প্রসার কমে যাচ্ছিল শুধু নয়, মানুষ ক্রমশ বেদবিমুখ হয়ে পড়ছিল। অথচ এই সনাতন ধর্মের মধ্যে যদি গ্লানি উপস্থিত হয় তাহলে সমগ্র মানব সমাজ হবে বিপথগামী। সেই গ্লানি দূর করে সনাতন ধর্মকে আবার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন আচার্য শঙ্কর। তিনি তাঁর প্রখর পাণ্ডিত্য, ক্ষুরধার বুদ্ধি, অসাধারণ বাগ্মিতা, মধুর ব্যবহার এবং নির্মল প্রেমের দ্বারা সকল সম্প্রদায়ের পণ্ডিত ও আচার্যদের হৃদয় জয় করে বৈদিক প্রকৃত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সকলের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, তাঁর প্রচেষ্টায় ধর্মাচরণের মধ্যে এসেছিল স্বচ্ছতা এবং ধর্মের মধ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষের ভাব হয়েছিল চিরতরে দূরীভূত।

আচার্য শঙ্কর তাঁর ধর্ম সংস্থাপনরূপ ঐশ্বরিক কর্মের জন্য সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করার সময় চারজন উপযুক্ত প্রধান শিষ্যকে সংগ্রহ করেন। আচার্য শঙ্কর যেমন অলৌকিক প্রতিভা সম্পন্ন বিদ্বান ছিলেন, সেরকম শিষ্য সম্পদও লাভ করেছিলেন। শ্রীবিদ্যার্ণবতন্ত্রে আচার্য শঙ্করের ১৪ জন বিশিষ্ট শিষ্যের কথা বলা হয়েছে যার মধ্যে ৫ জন ছিলেন সন্ন্যাসী এবং ৯ জন ছিলেন গৃহী। ওই ৫ জনের মধ্যে ৪ জন ছিলেন অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। তাঁরা হলেন সুরেশ্বরাচার্য, পদ্মপাদাচার্য, হস্তামলকাচার্য এবং তোটকাচার্য।

আচার্য শঙ্কর সনাতন ধর্মের প্রচার, প্রসার ও সংরক্ষণের জন্য ভারতের চার প্রান্তে চারটি মঠ স্থাপন করেন এবং চারজন প্রধান শিষ্যকে মঠাধ্যক্ষরূপে দায়িত্ব অর্পণ করেন। আর তিনি মঠ পরিচালনা করার জন্য 'মঠান্নায়' এবং 'মঠানুশাসনম্' (অর্থাৎ Memorandum of Association & Article of Association) নামক গ্রন্থে কতকগুলি নিয়মাবলী রচনা করেন। 'আন্নায়' বলতে কিছু নির্দেশ বা উপদেশ (Instructions) বুঝতে হবে।

(১) পশ্চিম ভারতে দ্বারকাপুরীতে শারদা মঠ স্থাপন করেন আচার্য শঙ্কর। সেখানের দেবতা সিদ্ধেশ্বর, দেবী ভদ্রকালী। এখানের বেদ সামবেদ। মহাবাক্য— 'তত্ত্বমসি'। প্রথম আচার্য হস্তামলকাচার্য। সিন্ধু, সৌরাষ্ট্র, মহারাষ্ট্র এবং পশ্চিম দিকের অন্তর্বর্তী প্রদেশমূহ এই শারদামঠের শাসনাধীন। এখানের সম্প্রদায়ের নাম কীটবার। ব্রহ্মচারীর নাম 'স্বরূপ' এবং সন্ন্যাসীর উপাধি তীর্থ ও আশ্রম। এখানের তীর্থ গোমতী।

(২) পূর্ব ভারতে জগন্নাথ পুরীতে অবস্থিত গোবর্ধন মঠ। এখানের দেবতা জগন্নাথ, দেবী বিমলা। বেদ হলো ঋগ্বেদ। মহাবাক্য— 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম'। প্রথম আচার্য পদ্মপাদাচার্য। পূর্ব ভারতের প্রদেশগুলি এই মঠের ধর্মের শাসনাধীনে থাকবে। সম্প্রদায়ের নাম ভোগবার। তীর্থ মহাসাগর। এখানের সন্ন্যাসীদের উপাধি হচ্ছে বন, অরণ্য। ব্রহ্মচারীর নাম 'প্রকাশ'।

(৩) উত্তর ভারতে বদরীকাশ্রমের কাছে আচার্য শঙ্কর স্থাপন করেন জ্যোতির্মঠ (যোশীমঠ নামেও প্রসিদ্ধ)। এই মঠের দেবতা নারায়ণ, দেবী পূর্ণাগিরি। এই মঠের বেদ হলো অথর্ববেদ। মহাবাক্য— 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম'। প্রথম আচার্য ছিলেন তোটকাচার্য। উত্তর ভারতের দেশগুলি এই মঠের শাসনাধীনে থাকবে। সম্প্রদায়ের নাম 'আনন্দবার'। ব্রহ্মচারীর নাম হবে 'আনন্দ' এবং সন্ন্যাসীর উপাধি হবে— গিরি, পর্বত ও সাগর। এই মঠের তীর্থ অলকানন্দা।

(৪) আচার্য শঙ্কর দক্ষিণ ভারতের রামেশ্বর ক্ষেত্রে স্থাপন করেন শৃঙ্গেরী পাহাড়ের ওপরে তুঙ্গাভদ্রা নদীর সংলগ্ন শৃঙ্গেরী মঠ। এই মঠের দেবতা আদি বরাহ, দেবী কামাক্ষী। এখানের বেদ যজুর্বেদ। মহাবাক্য— 'অহং ব্রহ্মাস্মি'।

প্রথম আচার্য ছিলেন সুরেশ্বরাচার্য। দক্ষিণ ভারতের চারটি প্রদেশ এই মঠের শাসনাধীন। সম্প্রদায়ের নাম ভূরিবার। ব্রহ্মচারী 'চৈতন্য' নামে প্রসিদ্ধ। আর সন্ন্যাসীর উপাধি হবে পুরী, ভারতী, সরস্বতী। এইভাবে আচার্য শঙ্কর চারটি মঠ স্থান করে সমগ্র ভারতকে এক ধর্মপাশে বেঁধে দিয়েছিলেন এবং তীর্থ, আশ্রম, বন, অরণ্য, গিরি, পর্বত, সাগর, পুরী, ভারতী, সরস্বতী নামে দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায় গঠন করে এক বিরাট সংগঠন গড়ে তোলেন যা আজও অম্লান রয়েছে। শুধু তাই নয়, 'মঠান্নায়'-এর সঙ্গে সঙ্গে 'মঠানুশাসন' তৈরি করে চারজন শঙ্করাচার্যের (চার মঠের প্রধান আচার্যদেরকেও শঙ্করাচার্য বলা হয়) জীবন কেমন হবে, কাজ কী হবে তারও নির্দেশ দিয়ে গেছেন। যাঁরা শঙ্করাচার্য হবেন তাঁদের সম্বন্ধে লিখে গেছেন, তাঁরা নিজ নিজ ধর্মাচরণে প্রযুক্ত হবেন, অন্যথায় তাঁদের শাসন করা হবে। তাঁরা ভূমণ্ডল সর্বদা পর্যটন করবেন। তিনি আরও বলেছেন, যেহেতু এখন ধর্মের প্রভূত ক্ষতি হয়েছে তাই এখন আলস্য ত্যাগ করে দক্ষতা অবলম্বন করতে মানুষের সেবায় কাজ করতে হবে। মাত্র বত্রিশ বছরের আয়ুষ্কালে এহেন আদর্শ সংগঠক এবং এত বড়ো প্রকৃত ধর্ম সংস্থাপক পৃথিবীর ইতিহাসে সত্যিই বিরল।

তথ্যসূত্র :

শিবাবতার আচার্য শঙ্কর। লেখক—শ্রীমৎ দেবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(লেখক সর্বভারতীয় প্রাচ্যবিদ্যা আকাদেমির অধ্যক্ষ)

(আদি শঙ্করাচার্যের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে প্রকাশিত)

ধর্মতলায় ধর্মঠাকুর পূজা

চন্দন রায়

ধর্মতলা নামের সঙ্গে এর মাহাত্ম্য কথা জড়িয়ে আছে। কোনো দীর্ঘজীবী বৃক্ষের তলায় প্রতিনিয়ত দেব-দেবীর পূজাপাঠ ও ধর্ম আচার করলে সেই স্থান পবিত্র স্থান হিসেবে বিবেচিত হয় এবং ধর্মতলা নামে স্থানীয় লোকমুখে পরিচিতি লাভ করে। কলকাতার ধর্মতলা এলাকা জব চার্নক সাহেবের বর্তমান কলকাতা পত্তনের আগে সুন্দরবন সন্নিহিত হোগলা, বাদাবন ও গোলপাতা বেষ্টিত জঙ্গল ও জলাভূমি ছিল এবং বিদ্যাধরী ও হুগলী নদীর সংযোগকারী বিভিন্ন খাঁড়ি ছিল। বহু সংখ্যক মৎস্যজীবী সম্প্রদায় ও বিভিন্ন জনজাতি জনগোষ্ঠী এই জঙ্গলবেষ্টিত ভূমিতে বহুকাল ধরে বসবাস করতো। এই সমস্ত জনগোষ্ঠী তাদের পরম্পরাগত ভাবে প্রাপ্ত সনাতনী ধর্মপালনের জন্য কোনো বহুবর্ষজীবী বৃক্ষের তলায় একটি নির্দিষ্ট আকার-বিহীন পবিত্র 'অকার' প্রস্তরখণ্ডকে দেবতা ও ধর্মের প্রতীক হিসেবে বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও ভাদ্র পূর্ণিমা তিথিতে ভক্তিসহকারে পূজা ও উপাসনা করতো। এই পবিত্র 'অকার' প্রস্তর ধর্মঠাকুর বা ধর্মরাজ বা ধর্ম হিসেবে পূজিত হতো। এই পূজাপার্বণ উপলক্ষ্যে এই অঞ্চলে তৎকালীন সময়ে গাজন মেলা-সহ বিভিন্ন লোকজ সাংস্কৃতিক উৎসব প্রচলিত ছিল এবং এই ধর্মবৃক্ষের তলায় অর্থাৎ ধর্মতলায় এই ধর্মঠাকুর বা ধর্মরাজের একটি মন্দির ধ্বংস ও বিলুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু একদিকে সনাতনী জনগোষ্ঠীর কাছে আনন্দের ও গর্বের স্থানটি এত ধ্বংসযজ্ঞ ও সুপরিকল্পিত নাম পরিবর্তনের প্রচেষ্টার পরেও সারা ভারতবর্ষে বা সারা বিশ্বের লোকমুখে ধর্মতলা নামে কলকাতার হৃদয় স্পন্দন হয়ে আছে।

আধুনিক কালের ধর্মতলা : বিদেশি শাসকদের পরিকল্পনায় জনজাতি সনাতনী জনগোষ্ঠী, ধর্মঠাকুর পূজা ও ধর্মরাজ মন্দির বিলুপ্ত হলেও ধর্মতলায় সনাতনী পরম্পরার ধর্ম সংস্কৃতি বন্ধ হয়নি কখনও। রানি রাসমণির আমলে ধর্মতলায় হিন্দু বাঙ্গালির বারো মাসে তেরো পার্বণ ও দোল-দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে ধর্ম আচরণ, গাজন, চড়কস প্রখ্যাত জেলেপাড়ার সং ও লোকজ মেলা এবং রামকথা, ভাগবত কথার আসর বসতো। আজও জনবহুল ব্যস্ততম ধর্মতলা প্রাঙ্গণে বিভিন্ন বৃক্ষের নীচে দেখা যায় প্রায় প্রতিনিয়ত বিভিন্ন দলের পণ্ডিত ও ভক্তদের রামকথা ও ভাগবত কথার আসর এবং ধর্ম আচরণ সনাতনী বিশ্বাসে পরম্পরাগত ভাবে করে আসছে। এটাই ধর্মতলার পরম্পরাগত সনাতনী ঐতিহ্য।

ধর্মতলা ভারতবর্ষ ও বাঙ্গলার অনেক উত্থান-পতন, উথাল-পাতালের পীঠস্থান। সাধক চৌরঙ্গীনাথের সাধনার তপোক্ষেত্র। যুগে যুগে বৃক্ষতলে রামকথা, ভাগবত কথা ও সনাতন ধর্মকথার প্রবচন ভূমি। রানি রাসমণির প্রতিবাদী সনাতন ধর্মাচারণ ক্ষেত্র। যুগে যুগে দেবী দুর্গামায়ের কৈলাশে ফিরে যাওয়ার যাত্রাপথ ও দশেরা উৎসবের মিলন ক্ষেত্র। বিভিন্ন মত, পথ ও বিশ্বাসের স্বাধীন বক্তব্য প্রচার ও প্রকাশের চারণভূমি। বিশ্ববরেণ্য মহান মনীষী, সাধু-সন্ত, সন্ন্যাসীর চরণধুলি ধন্য ও স্মৃতি বিজড়িত ভূমি। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে ভারতমাতার জঠর ও সূতিকাগার। ভারতমাতার শৃঙ্খল ভাঙার শপথ নেওয়া লক্ষ ছাত্র-যুবকের বুকের রক্তস্নাত ক্ষেত্র এবং নিত্য জীবন ও জীবিকার লড়াইয়ের কর্মক্ষেত্র। নিত্যদিনের মিটিং মিছিল, আগুন ঝরা বক্তব্য ও গণ-আন্দোলনের রণক্ষেত্রের নাম ধর্মতলা। সকল অন্যায়-অবিচার, অশুভ-অধর্ম কর্মের বিরুদ্ধে আন্দোলন লড়াই, সংগ্রাম এবং দেশ ও জাতির মঙ্গল ও কল্যাণার্থে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবাসীর কণ্ঠস্বর। এই স্থানটির লীলাভূমিতে প্রবহমান ঘটনাবলী স্থানটির মাহাত্ম্যকে উল্লেখযোগ্য করে তুলেছে। তাই ধর্মতলা হচ্ছে শাশ্বত সনাতন সংস্কৃতি ও সত্যধর্ম রক্ষা লড়াইয়ের রণক্ষেত্র ও ধর্মক্ষেত্র। জীবন সংগ্রামের এক তীর্থক্ষেত্র।

ধর্মঠাকুর ভাবনা ও দর্শন : ধর্মঠাকুর অর্থাৎ ধর্মরাজ বা ধর্মবিচারবোধ। যা সত্য ধারণা বহন ও রক্ষা করে তা-ই ধর্ম। ধর্ম ছাড়া বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কোনো কিছুরই অস্তিত্ব নেই। ধর্মই সকল বস্তুর অস্তিত্ব ধারণ, বহন ও রক্ষা করে। ধর্ম অর্থ সত্য দৃঢ় ও অটল। প্রস্তরও সত্য, দৃঢ় ও অটল। তাই প্রাচীন ধর্মতলার

জনগোষ্ঠী ধর্মের প্রতীক হিসেবে ধর্মঠাকুর বা ধর্মরাজ পবিত্র অকার প্রস্তর খণ্ডকে ভক্তি, পূজা ও উপাসনা করতো। তাদের কাছে ধর্মঠাকুর সর্বোচ্চ দেবতা। তিনিই মহাবিশ্বের স্রষ্টা এবং ধারক, বাহক ও রক্ষক। তাঁর স্থান ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবেরও উর্ধ্বে— যাকে ঈশ্বর হিসেব বর্ণনা করা হতো। তিনি সকল ব্যক্ত অব্যক্ত, মূর্ত, বিমূর্ত ও অমূর্ত সকল ঐশ্বর্যের অধীশ্বর। তাই আজও ভারতবর্ষের বনবাসী, গিরিবাসী ও সাধারণ ভারতবাসী বিভিন্ন নামে বিভিন্ন আকারের প্রাচীন সনাতনী পরম্পরার সংস্কৃতির পবিত্র প্রস্তরখণ্ডের শ্রদ্ধা ভক্তি পূজা ও উপাসনা লালন করে চলেছে। এটাই প্রাচীনের প্রতি নতুনের জয়গান।

দেশে দেশে পবিত্র প্রস্তরকে (Holy or sacred stone) শ্রদ্ধা বা ভক্তির উদাহরণ রয়েছে সারা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে। মানব সভ্যতা অঙ্কুরিত ও বিকশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রাকৃতিক, জাগতিক ও মহাজাগতিক সুশৃঙ্খল নিয়ম ও কর্মকাণ্ড চন্দ্র-সূর্য- গ্রহ-নক্ষত্রের ক্রিয়া, নিয়ম মাফিক ঋতু পরিবর্তন, দিন-রাত্রির আসা-যাওয়া, জন্ম-মৃত্যুর রহস্য, সৃষ্টি- স্থিতি-বিনাশ চক্র প্রাচীন মানবকুলের চিন্তার জগতে জিজ্ঞাসার আলোড়ন তোলে। এই প্রাকৃতিক, জাগতিক ও মহাজাগতিক নিয়ম ক্রিয়ার অন্তরালে এক অদৃশ্য সত্তা, শক্তি ও কর্তার অস্তিত্ব খুঁজতে শুরু করে এবং মানব ভাবনা ও চেতনায় এক সর্বময় সর্বশক্তিমান সত্তার বা কর্তার অস্তিত্ব স্বীকার করে নেয়, যা মানবভেদে ভাবনা ও চেতনার ধারণা ও বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল। তাই কখনো নিরাকার, কখনো আকার, আবার কখনো সাকার রূপে অসীম অদৃশ্য সত্তাকে সসীম ধারণা দিয়েছে ও বর্ণনা করেছে।

নিরাকার ভাবনা বা দর্শন খুবই সূক্ষ্মতম ভাবনা যা সাধারণের বোধগম্য নয়। তাই আদি প্রাচীনতম মানব সভ্যতায় সর্ব প্রথমেই ঈশ্বর ও ধর্ম পালনের জগতে সূর্য, পরবর্তীতে অকার বিভিন্ন পবিত্র প্রস্তর খণ্ডকে ধর্ম ও ঈশ্বরের প্রতীক রূপে শ্রদ্ধা ভক্তি পূজা ও উপাসনা শুরু করে। এটাই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন বিশ্বে প্রাচীন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ধর্ম ও ঈশ্বর ভাবনা ও চেতনায় প্রকাশিত, বিবেচিত ও দৃশ্যত সর্বপ্রথম আদি মৌলিক পূজা ও উপাসনা পদ্ধতি হিসেবে পথ চলা শুরু। যা আজও চলেছে। এটাই প্রাচীন বিশ্বের সর্বজনীন স্বীকৃত পূজা ও উপাসনা পদ্ধতি, যা আজও আধুনিক বিশ্বের সকল মতবাদে (ঈশ্বর বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী) সকল মানবকুল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে বিভিন্ন অকার ও আকারের বিভিন্ন প্রকারের পবিত্র প্রস্তরকে (holy stone/sacred stone) শ্রদ্ধা, ভক্তি, পূজা ও উপাসনা করে চলেছে। এই হলো ধর্ম ঠাকুর বা ধর্মরাজ পূজার মৌলিক বিশেষত্ব।

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মানব সমাজে পূজিত ও শ্রদ্ধাশীল পবিত্র প্রস্তর (holy stone বা Sacred stone) : ভারতবর্ষে ধর্মঠাকুর/ শিবলিঙ্গ/শালগ্রাম শিলা...কৈলাশ পর্বত ইত্যাদি।

গ্রিস— Baetylus, আফ্রিকা— stone snake, রোমান— Terminous, জাপান— Iwakura, আরবি ভূমি— black stone, throwing stone, Ansub, Buddhism— Buddha stupa, Christianism— Crucifix stone।

কেন প্রাচীন সভ্যতায় পবিত্র প্রস্তর উপাসনায় বিবেচিত : প্রস্তর যুগই আধুনিক মানব সভ্যতার ঊষালগ্ন। এই যুগেই মানব সভ্যতার সঙ্গে পাথরের ব্যবহার ওতপ্রোত ভাবে জড়িত এবং দৈনন্দিন জীবনে পাথরের ব্যবহারের গুরুত্ব ও ভূমিকা অপরিসীম যা আধুনিককালেও বিদ্যমান।

- হিংস্র পশু ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে জীবনকে ও পরিবারকে রক্ষার জন্য পাথরের গুহা ছিল সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয় স্থল।
- জীবিকা নির্বাহের জন্য পশু শিকার ও আত্মরক্ষার জন্য পাথরের হাতিয়ার ছিল প্রধান শক্তিশালী অবলম্বন।
- পাথরে পাথরে ঘর্ষণে প্রথম আগুন জ্বালানোর কৌশল আবিষ্কার ছিল মানব সভ্যতার বিস্ময়কর আবিষ্কার যাকে আধুনিক সভ্যতার প্রবেশ দ্বার বলা হয়।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগে পাথর সাধারণত ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, তাই এর ব্যবহারিক গুরুত্ব আদি থেকে বর্তমানকালেও অপরিসীম।
- প্রাচীনকাল থেকে বর্তমানকালেও প্রস্তরখণ্ড স্মৃতি স্মারক স্তম্ভ ও ভিত্তিপ্রস্তর হিসেবে শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে ব্যবহার হয়।
- সনাতন ভাবনা ও চেতনায় ঈশ্বর লয় ও ক্ষয়হীন। ধর্মেরও লয় ও ক্ষয় নেই। প্রাচীন ধারণায় পাথর দৃঢ়, দীর্ঘস্থায়ী; লয়, ক্ষয় নেই। তাই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে পবিত্র প্রস্তর বা holy stone পূজা ও উপাসনা রীতি প্রচলিত হয়।

প্রাচীন মানব গোষ্ঠীর জগৎ কল্যাণে মৌলিক ঈশ্বর ও ধর্ম ভাবনা আধুনিক বিশ্বের ঈশ্বর ও ধর্ম সংক্রান্ত সকল মতবাদের দিশারি। আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষেরা মানুষকে বাড়িঘর বানাতে শিখিয়েছে। চাষবাস করে খাদ্য উৎপাদন, আগুন জ্বালাতে এবং রান্না খাবার তৈরি সহ বহুবিধ কাজ শিখিয়ে যুগে যুগে মানব সভ্যতাকে বিকশিত করেছে। বনের শক্তিশালী পশুকে বশীভূত করে মানব সভ্যতার কল্যাণে ব্যবহার করেছে। আমাদের সর্বদা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণে রাখতে হবে আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষদের গড়া সভ্যতার উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে আমাদের বর্তমান সভ্যতার প্রাসাদ। তাই ধর্মতলার ধর্মঠাকুর বা ধর্মরাজ স্বরূপ পবিত্র প্রস্তর পূজা ও উপাসনা প্রাচীন মানব সমাজের মঙ্গল ও কল্যাণময় অবদানের ঋণ স্বীকার এবং তাঁদের (পূর্বজদের) শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করা।

এছাড়া আমরা অমৃতের পুত্র ভ্রাতৃসম। একই বিশ্ব একই নীড়ম, বসুধৈব কুটুম্বকম। সারা বিশ্বের মানবকুল একই সূত্রে গাঁথা। এই সত্য সনাতনী সম্প্রীতির বার্তা পুনঃপুনঃ ঘোষণা করা এবং জগৎ ও মানব কল্যাণ ভাবনার প্রাচীন ও নতুনের মেলবন্ধনের সেতু নির্মাণ করা। তাই ধর্মতলার ধর্মঠাকুর/ধর্মরাজ পূজা (Holy Stone/Sacred Stone) হয়ে উঠুক 'বিশ্ব সর্বজনীন ধর্মঠাকুর বা ধর্মরাজ পূজা'। □

ডালখোলায়ও প্রশাসনের উসকানিতে রামনবমীর শোভাযাত্রা আক্রান্ত হয়েছে

তরুণ কুমার পণ্ডিত

এ বছর রামনবমীর শোভাযাত্রার উপর জেহাদি দুষ্কৃতীদের আক্রমণের প্রতিবাদে সারা দেশ সরব হয়েছে। সম্প্রতি রামনবমী ও হনুমান জয়ন্তীতে পশ্চিমবঙ্গের ডালখোলা, হাওড়া ও রিষড়ার শোভাযাত্রার উপরে পাথর ছোঁড়া ও হিংসাত্মক ঘটনায় মানুষের মধ্যে যে ক্ষোভের সঞ্চার এবং আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটল তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক।

আমরা দেখেছি প্রতিবছরই রামনবমী ও হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষ্যে হিন্দুরা জাতপাতের ঊর্ধ্বে উঠে দলমত নির্বিশেষে সারা রাজ্যজুড়ে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় শামিল হন। প্রশাসনিক শৈথিল্য এবং রাজ্য সরকারের তোষণ নীতির কারণেই যে রামনবমীর শোভাযাত্রা ঘিরে এই অশান্তি তা শুনতে অপ্রিয় হলেও সত্যি বলে প্রমাণিত হয়েছে। রামনবমীর দিনে বিক্ষিপ্ত গণ্ডগোল ও শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারীদের আক্রান্ত হওয়ার ঘটনার পেছনে প্রশাসনের উসকানিমূলক বক্তব্য ও ইন্ধন ছিল। প্রশ্ন তো উঠবেই, সেই আপ্তবাক্য এখন কোথায় গেল, যেখানে বলা হয়েছে, 'ধর্ম যার যার উৎসব সবার?' তাহলে সংখ্যালঘু অঞ্চল দিয়ে হিন্দু শোভাযাত্রা যেতে পারবে না কেন? কই হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চল দিয়ে মহরমের তাজিয়া গেলে তো কোনো সমস্যা হয় না?

সরকার যদি আগে থেকেই এক সম্প্রদায়কে সংখ্যালঘু বলে তাদের এলাকা দিয়ে শোভাযাত্রা যাওয়া বন্ধ করে দেয় তাহলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশের ভূমিকা কী হতে পারে সহজেই অনুমেয়।

ফলস্বরূপ দেখা গেল হাওড়ার ঘটনার পর পরই মুখ্যমন্ত্রীর কড়া বার্তাই সার হয়েছে। রিষড়া স্টেশন এলাকায় দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব, ইটবৃষ্টি ও বোমা বর্ষণে যাত্রীদের চূড়ান্ত ভোগান্তি ও দুর্ভোগের চিত্র সকলের সামনে ধরা পড়েছে। আগে থেকে পুলিশের অনুমতি থাকা সত্ত্বেও কীভাবে শোভাযাত্রায় নির্বিচারে পাথরবাজি, পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর ও বোমা বর্ষণের ঘটনা ঘটে? গোয়েন্দা বিভাগ আগে থেকে হিংসাত্মক ঘটনা রোধে সতর্কতা অবলম্বন কেন করেনি? সরকার চাইলে এই অপ্রীতিকর দাঙ্গা প্রতিরোধ করতে পারত। কিন্তু আগে থেকেই মুসলমান এলাকায় রামনবমীর শোভাযাত্রা যাওয়ার ওপর শাসকদল প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করায় এবং ধর্ম পালনে রং দেখে বিরূপ মন্তব্য করায় সংঘর্ষ হয়েছে বলে অনেকেই মনে করছেন। ভোটব্যাংকে ধস দেখে, বিভেদের বেড়াজালে মুসলমানদের আবদ্ধ করে এবং পুলিশ প্রশাসনকে সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করে যে সর্বনাশা খেলায় রাজ্য সরকার মেতে উঠেছে তাতে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। তারা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছেন না, বাংলাদেশের মতো মুসলমান প্রধান দেশে যদি নির্বিঘ্নে রামনবমীর শোভাযাত্রা জয় শ্রীরাম ধ্বনির মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করতে পারে তবে হিন্দু প্রধান পশ্চিমবঙ্গে কেন রামনবমীর শোভাযাত্রা বাধাপ্রাপ্ত হবে? সেদেশে তো মসজিদ এবং ৯০ শতাংশ মুসলমান জনবহুল এলাকা দিয়ে রামনবমীর বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রাকে যেতে হয়েছে।

বাংলাদেশে রামনবমীর শোভাযাত্রার উপর একটি হামলার বা আক্রমণের ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি। উপরন্তু সেখানকার হিন্দুরা রামনবমীর শোভাযাত্রায় এ রাজ্যের হিংসাত্মক ঘটনা দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। তাহলে এখানে কেন রামনবমীর শোভাযাত্রা সংখ্যালঘুদের এলাকা হয়ে যেতে পারবে না? মুসলমানরা এতটা অসহিষ্ণু ও হিংস্র নয় যে তারা শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রাকে অযথা আক্রমণ করবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এর আগেও প্রশাসনের সর্বোচ্চ পদে আসীন ব্যক্তিকে বলতে শোনা গেছে, যে গোরু দুধ দেয় তার লাথি খাওয়া ভালো। মনে রাখতে হবে, দেশের সংবিধানে আইনের ঊর্ধ্বে কেউ নন। তিনি প্রধানমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী যেই হোন না কেন।

ডালখোলায় পুলিশের আগাম অনুমতি থাকা সত্ত্বেও হিন্দুদের রামনবমীর শোভাযাত্রা নির্দিষ্ট রাস্তা দিয়ে যেতে বাধা দেওয়া হয়। ফলে প্রথমে পুলিশের সঙ্গে বচসা ও গণ্ডগোল বাধে, তারপর স্থানীয় মুসলমানদের উত্তেজিত করে গণ্ডগোল বাধানো হয়। পুলিশের গাড়িতে অগ্নি সংযোগ করায় পুলিশ সেখানে হিন্দুদের গ্রেপ্তার এবং ব্যাপক ধরপাকড় করে বাড়িঘর ছাড়া করেছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে সেদিন পুলিশ শোভাযাত্রা পূর্বনির্ধারিত পথ দিয়ে যেতে দিলে ডালখোলায় কোনো গণ্ডগোলই হতো না। কিন্তু সরকার চেয়েছিল এইভাবে সংঘর্ষ ছড়িয়ে তোষণের মাধ্যমে সংখ্যালঘু ভোটব্যাংক ভরাট করে ঘোলাজলে মাছ ধরতে। অর্থাৎ সরকার না চাইলে রাজ্যের কোথাও কোনো দাঙ্গা হতে পারে না। আমাদের দুর্ভাগ্য, দুর্গাপূজার বিসর্জন, হনুমান জয়ন্তী, রামনবমীর শোভাযাত্রা ও অন্যান্য হিন্দুদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান করতে রাজ্য সরকারের অনুমতি না পেয়ে উচ্চ ন্যায়ালয়ের অনুমতি নিতে যেতে হয়।

আর ইদের দিনে পশ্চিমবঙ্গের বেশ কিছু এলাকায় জাতীয় সড়ক বন্ধ করে নমাজ পড়ার আয়োজন হলেও সেটি আইনি স্বীকৃতি পেয়ে ছাড় পেয়ে যায়। এর চেয়ে দ্বিচারিতা আর কী হতে পারে? আকণ্ঠ দুর্নীতিতে ডুবে থাকা রাজ্য সরকার জনগণের দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতেই কি এভাবে শান্ত পশ্চিমবঙ্গের পরিবেশকে অশান্ত করে দাঙ্গা ও সাম্প্রদায়িকতার রং তৈরি করে তালিবানি শাসন কায়েম করতে চাইছেন? সহিষ্ণু সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুসমাজ আজ মুসলমানদের কাছে টেনে নিয়েছে বলেই এই রাজ্যে পবিত্র ইদ বা মহরমের ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনে তাদের কোনো অসুবিধা হয় না। কিংবা অনেক হিন্দুদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে মুসলমানদের একত্রে আসতে দেখা যায়। সরকারের নিকট বিনীত অনুরোধ দয়া করে আমাদের রাজ্যের হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, সৌভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ রয়েছে তাকে আর বিরূপ মন্তব্য দিয়ে ও রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়িয়ে বিভেদের বিষে কলুষিত করবেন না। □

ফ ঃ ৫

মোদী সরকারের আমলে দেশের দারিদ্র্য হ্রাস

সুদীপ নারায়ণ ঘোষ

বিশ্বজোড়া মুদ্রাস্ফীতি ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে নাস্তানাবুদ হচ্ছে গোটা দুনিয়া। কিন্তু পাশ্চাত্যে এই তুমুল আর্থিক ঝড়ঝাপটা চললেও ভারত তার অর্থনৈতিক স্থিতি, ভারসাম্য এসব বজায় রেখে চলেছে। ঠিক এই মুহূর্তে পশ্চিম বিশ্বে বাসস্থান সমস্যা, দারিদ্য ও আর্থিক অপচয় এক অতি কঠিন বাস্তব সত্য। বড়ো বড়ো কোম্পানিগুলোয় হাজারে হাজারে চাকরি যাচ্ছে। ভারত তথা কংগ্রেস-কমিউনিস্ট বাস্তুতন্ত্র কিন্তু বিস্ময়কর ভাবে বাইডেন প্রশাসনের বিরুদ্ধে মৌন অবলম্বন করেছে। অথচ ডোনাল্ড ট্রাম্প রাষ্ট্রপতি পদে আসীন হওয়া থেকে তার বিদায় পর্যন্ত আমরা শুনে এসেছি যে সব চাকরি চলে যাবে। তখন কিন্তু যায়নি। দুটো বড়ো ব্যাংক দেউলিয়া হয়েও বন্ধ হয়নি। এখন এসব হচ্ছে, সবাই কেমন নির্বিকার। কেন এমন পক্ষপাতিত্ব?

বিশ্ব সংস্থাসমূহের গবেষণা অনুযায়ী ২০১১ সালের ভারতে চরম দারিদ্র্য ছিল ২২.৫ শতাংশ এবং ২০১৯ সালে তা ১০.২ শতাংশে নেমে এসেছে। এর মানে ২০১১ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে ভারতে চরম দরিদ্রের সংখ্যা ১২.৩ শতাংশ কমেছে। বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ)-এর নীতিনির্ধারক গবেষণা পত্রে এ তথ্য সমর্থিত হয়েছে। দেশের অর্থে সরকারি বণ্টন ব্যবস্থায় মাধ্যমে ভারতে এটা সম্ভব হয়েছে। এর ফলে ভোগ বৈষম্য গত চল্লিশ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন স্তরে পৌঁছেছে। শহরের তুলনায় গ্রামীণ এলাকাগুলো এই তালিকায় এগিয়ে রয়েছে।

আইএমএফ-এর প্রতিবেদন অনুসারে ভারতে দারিদ্র্য হ্রাসে প্রধান ভূমিক নিয়েছে 'প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনা'। এতে ২০২০ সালে চরম দারিদ্র্যকে ০.৮ শতাংশে বেঁধে রাখতে দেশ সমর্থ হয়েছে। এই প্রকল্পে দরিদ্রদের বিনামূল্যে খাদ্যশস্য সরবরাহ করা হয়। নোটবন্দির সময়ে ২০১৬ সালে দেশে শহুরে দারিদ্র্য ২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল, তবে এর পরেপরেই তা ভীষণভাবে কমেছে। ভোগ বৈষম্য বাড়েনি। ক্ষুদ্র কৃষকদের বার্ষিক আয় ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। বৃহৎ কৃষকদের আয় ২ শতাংশ বেড়েছে।

কোভিডের প্রাক্কালে ২০১৮-১৯-এ দারিদ্র্য দ্রুতভারে হ্রাস পেয়েছিল। ২০১৯-২০২০ সালে গ্রামীণ এলাকায় কম হারে দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে। আবার ২০২০-২১ বর্ষে দারিদ্র্য দারুণভাবে কমে যায়। এপ্রিল-জুন ২০২১ সময়কালে অতিরিক্ত ৫ কেজি খাদ্যশস্য বিনামূল্যে বিতরণের সঙ্গে শহুরে দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে। কোভিড পর্বে কৃষি তার আগের সমৃদ্ধি থেকে সরেনি বরং উৎপাদন রীতিমতো বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে দারিদ্র্যদূরীকরণ প্রকল্পগুলোর কার্যকারিতা প্রমাণ হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সুপার পাওয়ার হিসেবে চিহ্নিত। সেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো উন্নত দেশের সঙ্গে লোকে ভারতের অসম তুলনা করে। এটা খুব হাস্যকর কারণ গোড়া থেকেই ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিবন্ধিকৃত কোম্পানির সমস্ত উৎপাদন চীনে সঞ্চালিত হয় আর ভারতের কোম্পানিগুলোর উৎপাদন ভারতেই হয়। ভারতের জনসংখ্যা ১৩৮ কোটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তা উল্লেখযোগ্য ভাবে কম, ৩৩ কোটি। দুই দেশের অর্থনীতির মধ্যে তুলনা করা যায় না।

স্বাধীনতার আগে থেকে ভারত চরম দারিদ্র্যের মধ্যে পড়েছিল কারণ ঔপনিবেশিক আমলে আমাদের বিপুল সম্পদ, ১৯৪৫ সালে যার মূল্য ছিল প্রায় ৪৫ লক্ষ কোটি ডলার, লুট করা হয়েছিল। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেই ধনী ইউরোপীয়দের দ্বারা যারা ভারত-সহ এশিয়া ও আফ্রিকা লুট করেছিল। এখনও মার্কিন কেন্দ্রীয় ব্যুরো অনুযায়ী আমেরিকান জনসংখ্যার ১১.৬ দরিদ্র অর্থাৎ ৪ কোটি লোক দরিদ্র। প্রতিবেদনে আরও দাবি করা হয়েছে যে সেই ১৯৬০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দারিদ্র্যের অবস্থা একই রকম আছে।

বস্তুত পরিস্থিতি তার চেয়েও অনেক খারাপ। সিএনবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মার্কিন দারিদ্র্যের পরিমাপ সঠিক নয়। সরকার যে ব্যবস্থা নিয়েছে তা পরিস্থিতির সঠিক মূল্যায়নের পক্ষে অপর্যাপ্ত। যদিও কেন্দ্রীয় ব্যুরোর তৈরি পরিপূরক দারিদ্র্য পরিমাপ খাদ্য, পোশাক ও মৌলিক সুযোগ-সুবিধাগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে ও প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে যে সূচকগুলো আমেরিকার পরিবর্তিত জীবন ধারার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারছে না।

ওয়াশিংটন পোস্ট জানাচ্ছে, এত অল্প জনসংখ্যা, বিশাল আয়তন, বিশ্বের বৃহত্তম সম্পদের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও আমেরিকানরা বাসস্থান সমস্যায় জর্জরিত। ২০২২ সালের এক প্রতিবেদনে নিউইয়র্ক টাইমস জানিয়েছে যে আমেরিকায় গৃহহীনতার পরিস্থিতি ধারণার বাইরে। ন্যাশনাল লো ইনকাম হাউজিং কোয়ালিশনের মতে অত্যন্ত নিম্ন আয়ের সত্তর লক্ষ লোক ভালো বাড়ি পায় না, প্রতিবেদনে স্পষ্টভাবে দাবি করা হয়েছে যে ডেমোক্র্যাট পরিচালিত বড়ো শহরগুলোয় কয়েক দশক ধরে গৃহহীনতার সমস্যায় লোকে ভুগছে।

ইকনমিক টাইমস-এর মতে যুক্তরাষ্ট্রকে ছাড়িয়ে গেছে ভারত

গত এক দশকে মোদী সরকারের 'তৃণমূল স্তর' নীতির ফল ভারতের ক্রমহ্রাসমান দারিদ্র্য। গ্রামীণ দারিদ্র্য হ্রাস 'প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনা'র সাফল্যের চিহ্ন। সেই সঙ্গে আছে গ্রামীণ সংযুক্ত করার জন্য পরিকাঠামো উন্নয়নে জোর দেওয়া, বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি ও উন্নত সেচ সুবিধার কারণে আরও ভালো আর্থিক ভিত তৈরি হয়েছে। অন্য দিকে ইউএসও যেন এক অমিতব্যয়ী সন্তান, তার সমস্ত সম্পদ অর্থহীন সাধনায় উজাড় করে দিয়েছে। আমেরিকান যুবকরা ঋণে জর্জরিত এবং দু মুঠো অন্ন জোগাতে সংগ্রাম করছে। স্বাস্থ্য পরিষেবার উপর আমেরিকান জনসাধারণের মোহ উধাও। □

ছোটোদের খাবারে চোরের লালসার থাবা

সঞ্জীব দে

এ যেন চুরির ষোলোকলা পূর্ণ করলো পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান শাসকদল। ছ'মাসে লোপাট শত কোটি। এক অবিশ্বাস্য অভিযোগ উঠলে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে। মাত্র ছ' মাসে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের ১৬ কোটি অতিরিক্ত মিড-ডে মিলের ১০০ কোটি টাকা দুর্নীতি হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। কেন্দ্রের কাছে এমনই রিপোর্ট জমা দিল রাজ্যে ঘুরে যাওয়া কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের এক বিশেষ দল। এমন খবর প্রকাশ্যে আসায় খুব স্বাভাবিক কারণেই তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠছে শাসক দলের নেতা, মন্ত্রীরা।

সম্প্রতি খবরটি প্রকাশ্যে এলেও মিড-ডে মিলের চুরি এক সুপরিকল্পিত ও দীর্ঘদিনের। রীতিমতো চুরির ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করে শাসক দলের নেতা, কর্মীরা এই কুকর্মটি করে চলেছেন। তার জ্বলন্ত উদাহরণ চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহের ঘটনাটি। পূর্বমেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রাম ২নং ব্লকের সুবাদি মহেশ্বরী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের টিচার- ইনচার্চ মনোরঞ্জন জানার বিরুদ্ধে স্কুলের মিড-ডে মিল-সহ একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। এহেন দুর্নীতির প্রতিবাদ করেন স্কুলের পুরনো শিক্ষক অনিমেষ দাস। রাজ্যে প্রতিবাদের ফল যে কত ভয়ানক হতে পারে তা আমরা আগেও দেখেছি। এক্ষেত্রে দুর্নীতির বিরুদ্ধে মুখর হওয়ায় তড়িঘড়ি হোয়াটস-অ্যাপের মাধ্যমে বদলির চিঠি পাঠিয়ে দেওয়া হয় প্রতিবাদী শিক্ষককে। ছোটোদের মিড-ডি মিলের কাটমানি রুখতে স্কুলের এক যোগ্য শিক্ষকের বদলির বিষয়টা মেনে নিতে পারেনি অভিভাবক ও এলাকাবাসী। তারা একত্রিত হয়ে স্কুল ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায়। অবশেষে বিদ্যালয় পরিদর্শক বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেন।

রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর সদাই তৎপর চোর বাঁচাতে। সম্প্রতি আর একটি ঘটনা হলো, গত মার্চে বকেয়া ডিএ-র দাবিতে ধর্মঘটের কারণে বেশ কিছু স্কুলের পঠনপাঠন বন্ধ ছিল। আর সেই কারণে ২৪ পরগনার বাগদার কেনিয়ারা যাদবচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়ের স্কুল শিক্ষকদের উদ্দীপনায় ছুটির দিন স্কুল চালু রেখে সেই ঘাটতি মেটানোর চেষ্টা করেন। শিক্ষকদের উদারতায় নিজেরাই চাঁদ তুলে পড়ুয়াদের মিড-ডে মিলের সুব্যবস্থা করে দেন। আর এতে খুশি হয় স্কুলের পড়ুয়া-সহ অভিভাবকেরা। পশ্চিমবঙ্গের জোড়াতাপ্পি দেওয়া শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যেও ছুটির দিন স্কুল খোলা রেখে যাদবচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। অথচ এতে বিরক্তি প্রকাশ করে তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েত সমিতি। সমিতির সভাপতি গোপা রায় দলীয় কর্মীদের নিয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষক অনুপম সরদারকে ঘেরাও করে চাকরি কেড়ে নেবার ভয় দেখিয়ে, জোর করে প্রধান শিক্ষককে দিয়ে লিখিয়ে নেওয়া হয় মুচলেখা। গোপা রায়ের বক্তব্য, ছুটির দিন স্কুল খুলে নাকি ছোটোদের শৈশব কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। শাসক দলের নেত্রীর হুমকির হাত থেকে রেহাই পাননি স্কুলের মিড-ডে মিলের মহিলা কর্মীরাও।

গত ফেব্রুয়ারি মাসে স্কুলভবন নির্মাণের ২০ লক্ষ টাকা তছরুপের অভিযোগে গ্রেপ্তার হয় পুরুলিয়ার মানবাজার ১ নম্বর ব্লকের বনমহড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রণব মণ্ডল। স্কুল ভবন না থাকায় ৭০ জনের বেশি পড়ুয়া নিয়ে গাছের তলায় পড়াশোনা চলছিল দীর্ঘদিন ধরে। খোলা আকাশের নীচেই কচিকাঁচাদের মিড-ডে মিলের রান্না হতো। স্কুল ভবন নির্মাণের ২০ লক্ষ টাকা ছিল স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকের নামে থাকা ব্যাংক আকাউন্টে। টাকা আত্মসাৎ করেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক।

রাজ্যে শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি ও শিক্ষা ব্যবস্থার অবনতির খবরের মাঝে শিক্ষককুলকে কলিমালিপ্ত করা এই ঘটনাটি বড়োই বেদনাদায়ক। ঘটনাটি মালদার ইংরেজ বাজারের অমৃতি কলোনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের। বিক্ষোভকারী গ্রামবাসীরা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ঘরবন্দি করে রেখে এর প্রতিবাদ জনিয়েছিলেন। জানুয়ারির প্রথমে রাজ্যের স্কুল শিক্ষা দপ্তর ঢাক-ঢোল পিটিয়ে নতুন বছরে পড়ুয়াদের জন্য নতুন মেনুর ঘোষণা করেছিল। সেই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, পড়ুয়াদের জন্য সপ্তাহে চারদিন অতিরিক্ত ডিম-মুরগির মাংস ও ফল খাওয়ানোর জন্য ছাত্র পিছু ২০ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। পরের সপ্তাহে খাদ্যসাথি সুরক্ষার ৪০ বস্তা চাল সাতসকালে পাচার করতে গিয়ে ধরা পড়ার ভয়ে রাস্তার উপর ফেলে পালিয়ে যায় চোরের দল। ঘটনাটি ঘটে পশ্চিম মেদিনীপুর ঘাটালের মনসুকা গ্রামে। সরকারি স্ট্যাম্প দেওয়া চালের বস্তা রাস্তর ধুলোয় পড়ে থাকতে দেখে গ্রামবসীরা ঘাটাল থানায় খবর দেয়। ঘটনাটির তদন্তের আশ্বাস দিয়েছিলেন ঘাটাল ব্লক তৃণমূল সভাপতি দিলীপ মাঝি। চোর এখনো ধরা পড়েনি।

আজও বহু স্কুলে পানীয় জলের সুব্যবস্থা নেই, ছোটোদের মিড-ডে মিলের খাবারে টিকটিকি, চালের ড্রামে মরা ইঁদুর। গত দু'মাসে খবরের শিরনামে থাকা এই খবরগুলির সঙ্গে শিক্ষক সমাজকে লজ্জায় ফেলা খবরটি হুগলি জেলার আরামবাগের মলয়পুরের ডিহালপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক মদ্যপ অবস্থায় শিক্ষাঙ্গনে। তিনি মাতাল অবস্থায় ছাত্র পড়াতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। পরে তাঁকে স্কুল থেকে বের করে দেওয়া হয়।

পড়ুয়াদের মিড-ডে মিলের বরাদ্দ বাড়ানো হলো, ঠিক তেমনি বাড়লো লুটপাট। এ যেন এক অদ্ভুত যোগ? গত ফেব্রুয়ারির প্রথমে বাসন্তী থানার ভাঙনখালির মোল্লাপাড়ার আঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে দীর্ঘ সময় ধরে চলে ভাঙচুর, লুটপাট। রাতের অন্ধকারে লাঠি, লোহার রড ও ধারালো অস্ত্র হাতে জনা পঞ্চাশ দুষ্কৃতী এলাকার বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করে ৪৫৮ নম্বর আঙ্গনবাড়ি কেন্দ্রে রাখা সমস্ত শিশুখাদ্য নিয়ে চম্পট দেয়। যাবার সময় চোরেরা পানীয় জলের নলকূপটিও ভেঙে নিয়ে চুরির ষোলোকলা পূর্ণ করে। ঘটনায় শাসক দলের গোষ্ঠীকোন্দল প্রকাশ্যে এনে স্থানীয় যুব তৃণমূলের কর্মীরা বলেন, আঙ্গনবাড়ি কেন্দ্রটি দখল করে ফয়দা তোলার জন্য তৃণমূল কংগ্রেসের মোজ্জাম্মেল হক সর্দারের নেতৃত্বে চলে এই লুটপাট। ❑

কল্যাণের কল্যাণ কাজ

নিলয় সামন্ত

ভারতীয় ফুটবলে কল্যাণ চৌবেই হচ্ছেন প্রথম ব্যক্তি যার পরিচয় ছিল ফুটবলার আর এখন ভারতীয় ফুটবলের সর্বময়কর্তা। তিনি আসার পর এমন কিছু প্রতিশ্রুতি দেননি যাতে করে মানুষের চমক লাগে। বরঞ্চ তিনি ধীরে ধীরে ভারতীয় ফুটবলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন। সাম্প্রতিককালে তিনি দুটো সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। প্রথমটা হলো আইএসএলএ অবনমন। আর দ্বিতীয়টা হলো স্থানীয় লিগে বিদেশিদের না খেলানো।

দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটা নিঃসন্দেহে ভারতীয় ফুটবলার তুলে আনার ক্ষেত্রে অনেক সাহায্য করবে। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফুটবল অনুরাগীরা দু'দলে ভাগ হয়ে গিয়েছেন। তাদের আশঙ্কা বিদেশি ফুটবলার না থাকলে ম্যাচগুলো আদৌ দৃষ্টিনন্দন হবে কি? আবার এটাও ঠিক শুধুমাত্র বিদেশি খেলালে ভারতীয় ফুটবলারদের খেলার সুযোগই থাকবে না ঘরোয়া আসরে।

২০১৪ সালে শুরু হয়েছিল আইএসএল। এতদিন পর্যন্ত দলগুলি লড়াই করেছে শুধু চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লক্ষ্য নিয়ে। অবনমন বাঁচানোর চিন্তা করতে হয়নি তাদের। আগামী মরসুম থেকে সেই চিন্তাও করতে হবে। আইএসএলকেই ভারতের এক নম্বর লিগের স্বীকৃতি দিয়েছে এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন। প্রতিযোগিতার চ্যাম্পিয়ন দল এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলার সুযোগ পায়। যেমন এবার লিগে চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় সেই সুযোগপাবে মুম্বই সিটি এফসি।

আটটি দলকে নিয়ে শুরু হয়েছিল আইএসএল। দলের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১১টি। তবু কোনও দল আই লিগ চ্যাম্পিয়ন হলে সরাসরি আইএসএল খেলার সুযোগ পেত না এতদিন। আবার আইএসএলের শেষ দলকে নেমে যেতে হতো না আই লিগে। আগামী মরসুম থেকে আর তেমন হবে না। লিগের পয়েন্ট তালিকায় শেষ স্থানে থাকলে পরের মরসুমে খেলতে হবে আই লিগ। অন্যদিকে আই লিগ চ্যাম্পিয়ন দল সরাসরি খেলার সুযোগ পাবে আইএসএল। যেমন এবার আই লিগ জয়ী রাউন্ড গ্লাস পঞ্জাব এফসি আগামী মরসুমে সরাসরি আইএসএল খেলার সুযোগ পাবে। যদিও তাদের আর্থিক শর্ত পূরণ করতে হবে।

কল্যাণ বলেছেন,'এই লিগের ন'বছর বয়স হয়ে গেল। শুরু থেকেই বা অন্তত পঞ্চম বছর থেকে দরজা খোলা রাখা উচিত ছিল। অথচ নির্দিষ্ট কয়েকটি দলই কেবল খেলার সুযোগ পাচ্ছে। অবনমন না থাকলে কোনও প্রতিযোগিতার মান বাড়ানো যায় না। এই বিষয়টা সংশ্লিষ্ট সকলকে ভাবতে হবে। কীভাবে ওপেন লিগে পরিণত করা যায়, সেটা ঠিক করতে হবে।' ফেডারেশন সভাপতির মতে, ১০ বা ১২টা দলকে নিয়ে লিগ হচ্ছে ঠিকই। কিন্তু যাদের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সুযোগ থাকে না, একটা সময় পর তাদের উৎসাহ নষ্ট হয়ে যায়। অবনমনের ভয় থাকলে কোনও দলই আর হালকা ভাবে নিতে পারবে না। কল্যাণ বলেছেন, 'অনেক সময় দলগুলি উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। এ ভাবে কোনও প্রতিযোগিতা এগোতে পারে না। ওপেন লিগ শুরু করার এটাই সেরা সময়। না হলে দেরি হয়ে যাবে। যত দ্রুত উত্তরণ ও অবনমন শুরু করা যাবে তত ভালো।'

রাউন্ড গ্লাস পঞ্জাব এফসি আগামী মরসুমে আইএসএল খেলার সুযোগ পাবে। সেজন্য তাদের অবশ্য আইএসএলের আর্থিক শর্ত পূরণ করতে হবে। এই বিষয়টি ভাবাচ্ছে আই লিগ খেলা দলগুলিকে। কারণ আর্থিক শর্ত পূরণ না করতে পারলে আই লিগ চ্যাম্পিয়ন হলেও আইএসএলের দরজা নাও খুলতে পারে। উদ্বেগের এই জায়গাটির সমাধান চান ফেডারেশন সভাপতি। সে জন্যই তাঁর নির্দেশ, কীভাবে ওপেন লিগ হবে, তা নিয়ে আলেচনা করুক সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলি।

কলকাতা লিগ কি আকর্ষণ হারাতে চলেছে? সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন বিদেশি ফুটবলার খেলানো নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় সেই আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। অবশ্য কেরল ফুটবল সংস্থা ইতিমধ্যে জানিয়েছে, তারা ঘরোয়া লিগে বিদেশি ফুটবলারদের খেলা নিষিদ্ধ করবে না। পশ্চিমবঙ্গের ফুটবল নিয়ামক সংস্থার কর্তারা কী করবেন?

ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবে বলেছেন, 'ভারতীয় স্ট্রাইকার তুলে আনতে রাজ্য লিগ-সহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতা অর্থাৎ রোভার্স কাপ, বরদলুই ট্রফি, আই লিগের দ্বিতীয় ডিভিশনে বিদেশি ফুটবলার খেলানো যাবে না।' তিনি আরও বলেছিলেন, 'একটা সময় জাতীয় দলে বাঙ্গালি স্ট্রাইকারদেরই আধিপত্য ছিল। এখন কেউ নেই। আমরা এই ছবিটা বদলাতে চাই।'

ফেডারেশনের এই সিদ্ধান্ত আদৌ কতটা বাস্তবসম্মত, তা নিয়ে চর্চা শুরু হয়ে গিয়েছে। কেরল ফুটবল সংস্থার সচিব অনিল কুমার পি কোঝিকোড় থেকে ফোনে বললেন, 'আমরা কেরলে ফ্যাঞ্চাইজি লিগ শুরু করতে চলেছি। বিদেশি ফুটবলার না খেললে প্রতিযোগিতার আকর্ষণই থাকবে না। স্পনসরও আসবে না। আমরা ফেডারেশনকে জানিয়ে দিয়েছি, বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে আমাদের চুক্তি হয়ে গিয়েছে। এখন পিছিয়ে আসা সম্ভব নয়। ফেডারেশন আমাদের বিদেশি ফুটবলার নিয়েই লিগ করার অনুমতি দিয়েছে।' আইএফএ কী করবে? সচিব অনির্বাণ দত্ত বললেন, 'লিগ চালাতে প্রায় ২ কোটি টাকা খরচ হয়। বিদেশিরা না খেললে স্পনসররা আদৌ থাকবে কি না, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। অন্যতম সেরা বাঙ্গালি স্ট্রাইকার শিশির ঘোষ বলছিলেন, 'বিদেশি ডিফেন্ডারদের বিরুদ্ধে খেললেই বাঙ্গালি স্ট্রাইকারদের উন্নতি হবে। বিদেশিরা না থাকলে ঘরোয়া লিগের আকর্ষণও কমবে।' □

সবুজের হাত ধরে জীবনের চৌমাথায়

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ পি.ভি. সতীশকে জাদুকর বললে অতিশয়োক্তি করা হয় না। তেলেঙ্গানার জাহিরাবাদ অঞ্চলের জনজাতি সম্প্রদায়ের মহিলারা ওঁকে জাদুকর বলেই মনে করেন। কারণ পি.ভি. সতীশের দেখানো পথে চলেই ওরা জীবনে সচ্ছলতার মুখ দেখেছেন। জাহিরাবাদের মতো প্রায় শুখা অঞ্চলে বাজরার চাষ খুব সহজ কাজ ছিল না। পি.ভি. সতীশ সেই অসম্ভবকে সম্ভব করেছিলেন। এবং স্থানীয় জনজাতি মহিলারা যার যেটুকু জমি আছে তাই দিয়ে একটা স্বপ্ন পূরণ করেছিলেন।

পি.ভি. সতীশের জীবনের দিকে তাকালে গোড়ায় একটু অবাকই হতে হয়। ১৯৪৫ সালের ১৮ জুন মহীশূরে জন্ম। পড়াশোনা দিল্লির ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব মাস কমিউনিকেশনে। কেরিয়ার শুরু সাংবাদিক হিসেবে। বিস্ময়টা এখানেই। কারণ পরবর্তী বেশ কয়েকটি দশক জুড়ে যিনি 'মিলেট ম্যান' নামে পরিচিত হবেন তিনি কেরিয়ার শুরু করলেন কিনা সাংবাদিক হিসেবে। যদিও সাংবাদিক হিসেবে তার জার্নি খারাপ হয়নি। প্রায় দু' দশক তিনি ছিলেন দূরদর্শনের প্রথম সারির প্রযোজক। মূলত গ্রামোন্নয়ন ও গ্রামের মানুষের শিক্ষা নিয়ে অনুষ্ঠান করতেন। তবে পেশাগত দক্ষতার বাইরে পি.ভি. সতীশের চরিত্রের বড়ো দিক হলো নবাগত সাংবাদিকদের প্রতি সহযোগিতামূলক মনোভাব। জীবনে যত সাংবাদিককে প্রথম ব্রেক দিয়েছেন তাদের মধ্যে একটি নাম সকলেই শুনেছেন। তিনি বিখ্যাত ক্রিকেট ভাষ্যকার হর্ষ ভোগলে। হর্ষ নিজেই একটা টুইটে লিখেছেন, 'পি.ভি. সতীশ আমাকে ওর প্রযোজিত অনুষ্ঠানগুলিতে সঞ্চালনার দায়িত্ব দিতেন। দূরদর্শনে সঞ্চালনা করতে করতেই আমার কাছে ক্রিকেট ম্যাচে ধারাভাষ্য দেবার প্রস্তাব আসে। যে রাস্তায় আমি সহজে হাঁটতে পারি সেখানে পৌঁছে দেবার জন্য আমি আজীবন ওর কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।'

কিন্তু এতো শুধু পি.ভি. সতীশের ব্যক্তি মানসের পরিচয়। এই নিবন্ধের শুরুতেই আমরা ওকে 'জাদুকর' বলে উল্লেখ করেছি। এমন একটা ধারণা দিয়েছি যা ওর চরিত্রের

মানবিক দিকটিকে স্পষ্ট করে তুলবে। যে মানসিকতার ডাকে পি.ভি. সতীশ একদিন ডেকান ডেভলপমেন্ট সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করবেন।

২০২০ সালের জুন। মোনাকো ফাউন্ডেশনের প্রিন্স অ্যালবার্টের সঙ্গে এক আলাপচারিতায় সতীশ বলেছিলেন, 'পঁয়ত্রিশ বছর আগে আমরা যখন ডেকান ডেভলপমেন্ট সোসাইটি তৈরি করি তখন এই জাহিরবাদের মাটি ছিল সম্পূর্ণ বন্ধ্যা। একশো কিলোমিটারের মধ্যে কোথাও কোনও সবুজ চোখে পড়ত না। ডেকানের প্রথম কাজ ছিল জাহিরাবাদের মাটিকে চাষযোগ্য করা। পাথর আর কাঁকর সরিয়ে এবং বাইরে থেকে উর্বর মাটি এনে জমি ভরাট করে এই কাজ আমাদের করতে হয়েছে। দশ বছর ধরে আমরা জাহিরাবাদের মাটিকে পাথরমুক্ত করেছি।'

মাটি চাষের উপযোগী হয়ে ওঠার পর গ্রামের মানুষরা চাষে উৎসাহী হয়ে উঠল। এই সময় ৫০০০ মহিলা ডেকান ডেভলপমেন্ট সোসাইটিতে যোগ দেন। এরা সকলেই সমাজের প্রান্তিক শ্রেণীভুক্ত, আর্থ-সামাজিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া। কিন্তু যে কোনও প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হবার সাহস তাঁদের ছিল। আর যা ছিল তা হলো নিজের ভবিষ্যৎকে নতুন করে সাজানোর স্বপ্ন। তাঁরা জাহিরাবাদের জমিকে আবার সবুজ করে তোলার সংকল্প গ্রহণ করলেন। এবং সবুজ করলেনও। এইটুকু করেই ওরা থামলেন না। জাহিরাবাদ অঞ্চলের প্রতিটি গ্রামের ৫০,১০০,২০০ একর জমি অনাবাদি অবস্থায় পড়ে থাকত। এইসব জমি শুষ্ক আর ধুলো ও কাঁকরে পরিপূর্ণ। জনজাতি সমাজের প্রান্তিক মহিলারা সেই বন্ধ্যা জমিতেও গাছ লাগানো শুরু করলেন। অবশ্যই তার আগে সতীশের সংস্থা মাটি প্রস্তুত করে দিয়েছিল। কিন্তু গাছ লাগানোর পর কী হলো? জাহিরাবাদের চারপাশে গড়ে উঠল জঙ্গল।

এখনকার জাহিরাবাদ আগের মতো ধূসর নয়। তার যে দিকেই চোখ পড়ুক সে আদিগন্ত সবুজ। পি.ভি. সতীশ স্বপ্ন যেমন দেখেছিলেন তেমনি দেখিয়েওছিলেন। যে স্বপ্ন দেখে জনজাতি সমাজের মহিলারা এগিয়ে এসেছেন এই সবুজের অভিযানে এবং পৃথিবীর হাতে তুলে দিয়েছেন এক টুকরো স্বর্গ। □

শঠে শাঠ্যং

জীর্ণধন নামে এক ব্যবসায়ী বাস করত এক শহরে। সংসার প্রতিপালন করতে করতে এক সময় তার টাকাপয়সা শেষ হয়ে গেল। তাই সে বাণিজ্য করতে বিদেশে যাবার মনস্থ করল। তখন তার নিজের বলতে ছিল একটা লোহার ভারী দাঁড়িপাল্লা। দাঁড়িপাল্লাটি নিয়ে সে তার এক বন্ধু বাড়ি গিয়ে বলল, ভাই, আমি বাণিজ্য করেতে বিদেশে যাচ্ছি। দাঁড়িপাল্লাটি তোমার কাছে রেখে দাও। বাণিজ্য থেকে ফিরে এসে আমি এটি তোমার কাছ থেকে নেব। বন্ধুটি সানন্দে রাজি হয়ে দাঁড়িপাল্লাটি নিজের কাছে রেখে দিল।

এরপর কেটে গেল বেশ কয়েক বছর। ব্যবসা করে জীর্ণধন অনেক টাকাপয়সার মালিক হয়েছে। একদিন সে দেশে ফিরে এল। প্রথমেই সে বন্ধুর বাড়ি বাড়ি এসে তার রেখে যাওয়া দাঁড়ি পাল্লাটি চাইল। বন্ধুটি খুব দুঃখিতস্বরে বলল, ভাই, তোমার দাঁড়িপাল্লাটি তো ইঁদুরে খেয়ে ফেলেছে।

জীর্ণধন বলল, তাই নাকি! লোহার দাড়িপাল্লা ইঁদুরে খেয়ে ফেলেছে? আর কী করা যাবে ভাই। চিরকাল তো কোনো জিনিস থাকে না। এনিয়ে দুঃখ করার কিছু নেই। কিন্তু ভাই, আমি এখন নদীতে স্নান করতে যাব। তোমার ছোটো ছেলেটাকে আমার সঙ্গে দাও। স্নান করার সময় ও জিনিসপত্রগুলো পাহারা দেবে।

জীর্ণধন বন্ধুর ছেলেকে নিয়ে নদীতে স্নান করেতে গেল। স্নান সেরে ফেরার পথে ছেলেটিকে একটি গুহার মধ্যে রেখে গুহার মুখে একটা বড়ো পাথর দিয়ে আটকে রেখে বন্ধুর বাড়ি ফিরে এল। বন্ধু তাকে একা দেখে জানতে চাইল, আমার ছেলেটি কোথায়? জীর্ণধন বলল, দুঃখের কথা আর কী বলি ভাই, নদীর পাড়ে ও যখন দাঁড়িয়ে ছিল, তখন একটি বাজপাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে পালিয়ে গেল।

জীর্ণধনের কথা শুনে তার বন্ধু ভয়ানক রেগে গেল। চিৎকার করে বলল, বাজপাখিতে কখনো ছেলে নিয়ে যায়? এখনই আমার ছেলেকে ফেরত দাও নতুবা রাজার কাছে তোমার নামে নালিশ জানাবো।

এভাবে ঝগড়া করেত করতে তারা বিচারকের কাছে হাজির হলো। বন্ধুটি বিচরকের সামনে চিৎকার করে বলল, এই আমার বন্ধু জীর্ণধন। এ আমার ছেলেকে কোথাও লুকিয়ে রেখেছে। বিচারক বললেন, ওহে, ওর ছেলেকে কোথায় রেখেছ? এখনি দিয়ে দাও।

জীর্ণধন বল, হুজুর, ওর ছেলেকে তো বাজপাখিতে নিয়ে গিয়েছে, আমি কী করে ফিরিয়ে দেব? বিচারক বললেন, এ অসম্ভব ব্যাপার। জীর্ণধন বলল, হ্যাঁ হুজুর, লোহার দাঁড়িপাল্লা যদি ইঁদুরে খেয়ে ফেলতে পারে, তাহলে বাজপাখি কেন ছেলেকে নিয়ে যেতে পারবে না?

জীর্ণধন সমস্ত ঘটনা বিচারকের সামনে বলল। বিচারক ন্যায়বিচার করলেন। জীর্ণধন ফিরে পেল তার দাঁড়িপাল্লা এবং তার বন্ধু ফিরে পেল তার পুত্র। খুশি মনে তারা নিজের নিজের বাড়ির পথে পা বাড়ালো।

সংগৃহীত

বীর বনবাসী

নন্তরাম নেগী

উত্তরাখণ্ডের জৌনসার জনজাতির বীর যোদ্ধা নন্তরাম নেগীর জন্ম ১৭২৫ খ্রিস্টাব্দে জৌনসার পরগনার মলেথা গ্রামে। ওই সময় ওই এলাকা শিরমোর রাজ্যের অধীনে ছিল। এই রাজ্যের রাজধানী ছিল নাহান। মুঘল সর্দার কাদির খান দেরাদুন আক্রমণ করে নাহানের দিকে অগ্রসর হয়। সেই সময় নাহানের রাজা নাবালক থাকায় রাজমাতা মুঘলদের মোকাবিলা করার জন্য নন্তরাম নেগীকে বিশেষ দায়িত্ব দেন। দেশ ও ধর্ম রক্ষায় প্রচণ্ড লড়াই করে নন্তরাম মাত্র একুশ বছর বয়সে বীরগতিপ্রাপ্ত হন। আজও জৌনসার জনজাতির লোকগীতিতে নন্তরাম নেগীর বীরগাথা স্থানীয় লোকেদের মুখে মুখে ফেরে।

জানো কি?

- মোবাইল ফোন হারিয়ে গেলে ফোন ট্র্যাক করার ক্ষেত্রে IMEI (International Mobile Equipment Identity) নাম্বারটি বিশেষ প্রয়োজনীয়।
- স্মার্ট ফোনের ইন্টারনাল মেমারিকে র‍্যাম বলা হয়।
- ভারতে মোবাইল ফোন পরিষেবা ১৯৯৪ সালে শুরু হয়।
- ফোন রিসিভ বা কল করতে ভয় পাওয়াকে টেলিফোবিয়া বলা হয়।
- ফোনের ব্যাটারি চার্জ ২০ শতাংশের নীচে নামতে দেওয়া এবং ৯০ শতাংশের বেশি করা উচিত নয়।

ভালো কথা

স্কুলের বাগান

আমাদের স্কুলে বর্ষার সময় আমরা সবাই মিলে অনেক রকম ফুলের গাছ লাগিয়েছি। শীতের সময় অনেক ফুল ধরেছিল। বর্ষায় বেলফুল, জবা ও রজনীগন্ধা ফুল ফোটার কথা। কিন্তু এবারের প্রচণ্ড রোদে গাছগুলি নুইয়ে পড়েছিল। তাই কয়েকদিন থেকে আমরা সকালে ও বিকেলে জল দিতে শুরু করেছি। জল পেয়ে গাছগুলো অনেকটা তাজা হয়েছে। কিন্তু দুপুরবেলা নুইয়ে পড়ছে। স্যার বলেছে, ও কিছু নয়, চড়া রোদের জন্য।

শ্রেয়া মজুমদার, চতুর্থ শ্রেণী, নামোপাড়া, মানবাজার, পুরুলিয়া।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

উঃ কী গরম

জীবন ঘোষ, দ্বাদশ শ্রেণী, বড়জোড়া, বাঁকুড়া

সকাল হতেই বাড়ছে তাপ
পথ চলতির মাথায় হাত,
রোদ যেন নয় আগুন ঝরে
ঘরে মানুষ হাঁস ফাঁস করে।
দশটা বাজতেই রাস্তা ফাঁকা
বাজার হাট সবই ফাঁকা,
অফিস স্কুল শুধু খোলা
দুপুরে বন্ধ গাজন মেলা।

ভক্তরা সব গাছের তলে
গলা ভেজায় কলের জলে,
মাঝে মাঝে হুংকার ছাড়ে
'জয় ভোলেবাবা' উচ্চৈঃস্বরে।
তপ্ত রোদে দামাল ছেলে
টুপি মাথায় ক্রিকেট খেলে
বাকিরা সব গাছের তলে
উঃ কী গরম! শুধুই বলে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

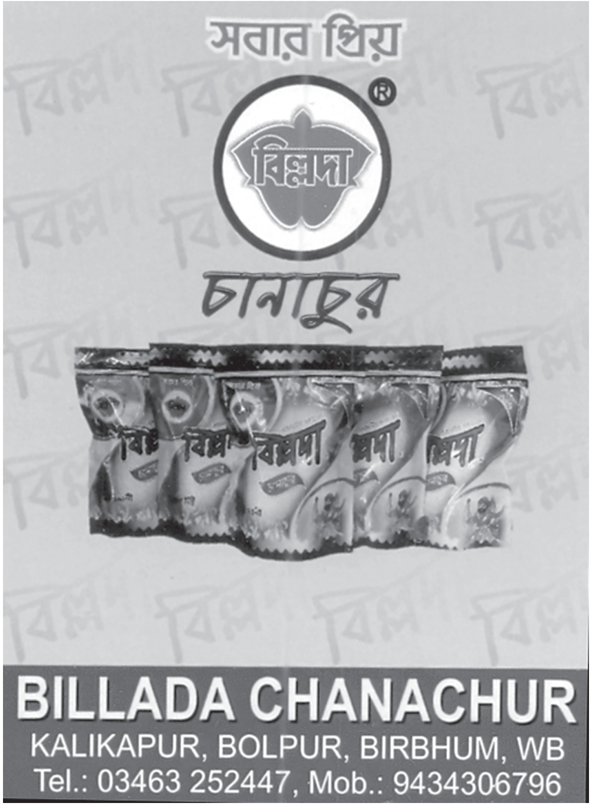

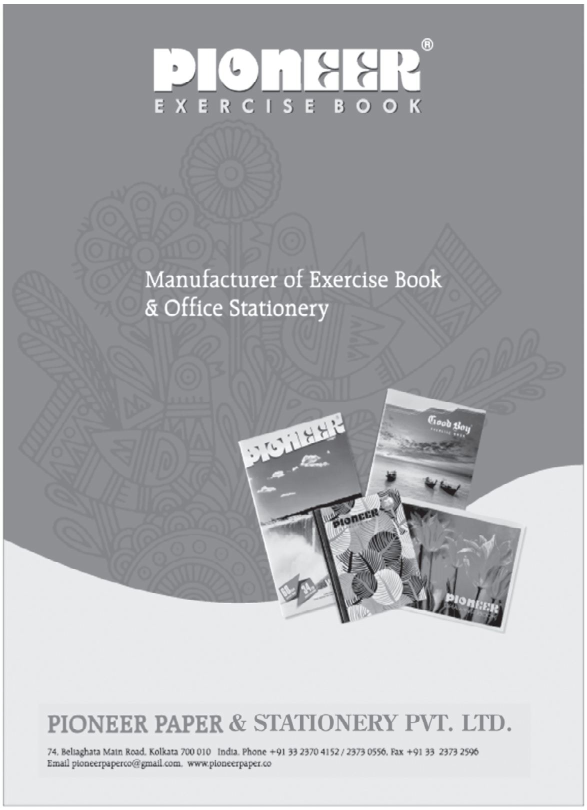

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব
কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের
ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।

মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

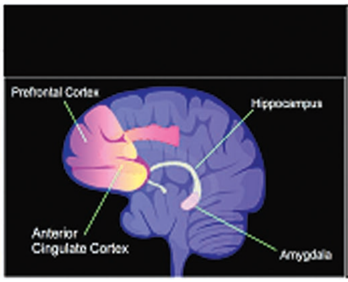

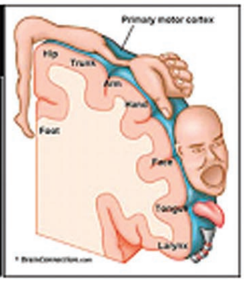

কান ধরে উঠ-বস করানোর শাস্তি এবং আধুনিক বিজ্ঞান

ডাঃ আর এন দাস

আমাদের দেশে ১৯০ বছরের ব্রিটিশ উপনিবেশিকতার ফলে বহুমুখী ও সর্বাঙ্গীণ গুরুকুল শিক্ষা ব্যবস্থা ১৮৩৫ সালে টি.বি. মেকলের ষড়যন্ত্রে সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংস হয়ে যায়। আসে কনভেন্ট প্রথায় শিক্ষা দান। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকেই বঙ্গপ্রদেশে শুরু হয়ে যায় ব্রাহ্মসমাজ ও ইয়ংবেঙ্গলের এক নতুন ধরনের চিন্তাধারা, যা ছিল প্রাচীন গৌরবময় বৈদিক সংস্কার পদ্ধতি ও সমাজের বিপরীত খ্রিস্টীয় সংস্করণ মাত্র।

গুরুকুল শিক্ষায় মুক্ত প্রাঙ্গণে বা বটবৃক্ষের নীচে প্রকৃতির সান্নিধ্যে পিতৃতুল্য স্নেহশীল গুরুর সামনে বসে গণিত, বিজ্ঞান, ভাষা, ব্যাকরণ, বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, দর্শন, শিল্প, শাস্ত্র ও শস্ত্রের অনুশীলন করা হতো। সে সময় উচ্চ-নীচ, জাতিবর্ণের কোনো ভেদাভেদ ছিল না। তার উদাহরণ হলো, সন্দীপন মুনির গুরুকুলে ক্ষত্রিয় রাজার ছেলে কৃষ্ণ আর গরিব ব্রাহ্মণপুত্র সুদামা সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে একই সঙ্গে নির্বিবাদে পড়াশোনা করত।

'গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুঃ গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ। গুরুঃ সাক্ষাৎ পরমব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।' স্নেহ, শাস্তি ও পুরস্কার— সবেরই প্রচলন ছিল ওই গুরুকুল শিক্ষা ব্যবস্থায়। অমনোযোগী, কমবুদ্ধি বা দুষ্টু ছাত্রের শাস্তি ছিল বুকের উপর আড়াআড়িভাবে দুই হাতে বিপরীত দিকের কান ধরে সকলের সামনে ৮,১৮,২৮ বা ১০৮ বার পর্যন্ত উঠ-বস করা। আর একই সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে অপরাধের পুনরাবৃত্তি না করার অঙ্গীকার করা। দুর্ভাগ্য আমাদের এই যে, এই অদ্ভুত শাস্তির পিছনে যে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আছে আমরা সেটা জানি না। কিন্তু বিদেশের বিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে আমেরিকাবাসী অভিভাবকরা এই শাস্তির গূঢ় রহস্য জেনে, নাম পালটিয়ে, 'সুপারব্রেন যোগা' করাচ্ছে নিজেদের সন্তানদের মেধা ও স্মৃতিশক্তি বাড়ানোর জন্য। দক্ষিণ ভারতে বা মহারাষ্ট্রের মন্দিরে প্রায়শই দেখা যায়, গণেশ মহারাজের সামনে দুই হাতে বিপরীত কান ধরে ভক্তরা 'বক্রতুণ্ড মহাকায় সূর্যকোটিসমপ্রভু। নির্বিঘ্নে কুরু মে দেব সর্বকার্যেষু সর্বদা।। —মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে ১০৮ বার উঠ-বস করে ক্ষমা প্রার্থনা করছে গজানন মহারাজের কাছে। এই প্রথা প্রাচীনকাল থেকেই ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে চলে আসছে। ধর্মভীরু ভক্তরা দৈনন্দিন জীবনে কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার উদ্দেশ্যে এই সহজ উপায়টি খুঁজে পেয়েছিলেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিক তত্ত্বটি ছিল অজানা।

ভারতের ঐতিহ্যময় প্রাচীন সভ্যতা, সংস্কৃতি, ভাষা, ধর্মাচরণ, রীতিনীতি ও জ্ঞানবিজ্ঞানকে বিদেশি আক্রমণকারীরা হাজার বছরের ক্রমাগত আক্রমণে ধ্বংস করে দিয়েছিল যেমনটি করেছিল ইরাক, ইরান, সিরিয়া ও মিশরে। আমেরিকার ইতিহাসবিদ উইল ডুরান্ট তাঁর বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ পুস্তক 'ইসলামিক কনকোয়েস্ট অব ইন্ডিয়াতে' পৃথিবীর সব থেকে জঘন্যতম রক্তাক্ত কাহিনির বিস্তৃত বিবরণ তুলে ধরেছেন। ঈশ্বর সুস্থ ও সুখী জীবনযাপনের জন্য দেহে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক— এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় এবং রূপ, শব্দ, গন্ধ, স্বাদ ও স্পর্শ নামক পাঁচটি ইন্দ্রিয় বিষয়ের সৃষ্টি করেছেন। এদের মধ্যে চক্ষু ও কর্ণের ভূমিকা হচ্ছে অসামান্য। মনই হচ্ছে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের চালক ও রাজা। তাই শব্দ, কর্ণ, মন ও বুদ্ধির মধ্যে আছে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।

হাতির চোখ ছোটো কিন্তু বিশাল কর্ণ আছে। তার মস্তিষ্কের টেম্পোরাল লোব সমস্ত স্তন্যপায়ী প্রাণীর মধ্যে বৃহত্তম। কথায় বলে, স্থলচর প্রাণীর মধ্যে হাতির স্মরণশক্তি সব থেকে দীর্ঘস্থায়ী। তাই বিশাল কর্ণের অধিকারী বক্রতুণ্ড বিনায়ক মহারাজকে ঋদ্ধি, বুদ্ধি ও সিদ্ধির অধিষ্ঠাতা দেবতা বলা হয়। মনন, চিন্তন ও স্মৃতিশক্তির রহস্য হচ্ছে, কানের উপর মস্তিষ্কের পার্শ্বদেশে টেম্পোরাল লোবে শব্দের এনকোডিং, স্মৃতির ভাণ্ডারে জমিয়ে রাখা ও প্রয়োজনে তাকে প্রত্যাহার করা। শাস্ত্রে মোক্ষপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে 'শব্দব্রহ্ম'কে ভেদ করার কথ বলা হয়েছে। আর শতপথ ব্রাহ্মণের মন্ত্রে, 'নাদব্রহ্ম' হলো এক অতীন্দ্রিয় ধ্বনি। ঋগ্বেদে বলা হয়েছে শব্দেই নাকি ব্রহ্মের বাস। সেই শব্দ বহিঃকর্ণের মাধ্যমে মধ্যকর্ণে প্রবেশ করে অন্তঃকর্ণের স্নায়ুকে উদ্দীপিত করে। মস্তিষ্কের টেম্পেরাল লোবে প্রবেশ করে ওই ধ্বনির বিশ্লেষণ, অর্থকে হৃদয়ঙ্গম এবং স্মৃতির ভাণ্ডারে সেই তথ্যের সংরক্ষণ করা হয়। এমনকী ১৯২২-এ এডউইন হাব্বলের বিগ ব্যাং তত্ত্বও স্বীকার করে সৃষ্টির সূচনা হয়েছিল নাকি এক বিশাল শব্দের মাধ্যমে। বাল্যকালে নামতা মুখস্ত করার নিয়ম ছিল উচ্চৈঃস্বরে একে অপরকে শুনিয়ে পড়া। বেদের সহস্র শ্লোক মুখস্থ করার সময়, উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করে পড়তে হয়। সহস্র বছর ধরে প্রবাহিত হয়ে চলেছে

ফঃ ৬

গুরু পরম্পরায় স্মরণ করার সেই একই প্রথা!

চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা বলেন, কানের রুগিরা বা যারা কানে কম শোনে তাদের মস্তিষ্ক বিশেষ করে টেম্পেরাল লোব অকালেই শুকিয়ে আয়তনে ছোটো হয়ে যায়। বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন, মুক ও বধির ব্যক্তির স্মরণ ও মননশক্তি সাধারণ মানুষের তুলনায় অনেকটাই কম হয়। মানুষের মধ্যে ৮৫ শতাংশ লোকই হয় ডানহাতি। তাদের বামদিকের মস্তিষ্কের টেম্পোরাল লোবকে ডোমিন্যান্ট বলে। এটা হচ্ছে ভাষাবোধ, স্মৃতি ও মৌখিক শব্দগত শিক্ষার স্থান। বিপরীত দিকের মানে ডান দিকের ওই মস্তিষ্কের ওই নন-ডেমিন্যান্ট টেম্পেরাল লোবের কাজ হচ্ছে, সুমধুর গানবাজনা অথবা চোখে দেখা কোনো জিনিসকে বোঝা বা মনে রাখা। দুদিকের মস্তিষ্কই যার সমানভাবে চলে তাকে সব্যসাচী বলে। অর্জুন ছিলেন পৌরাণিক যুগে আর আধুনিক যুগে স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন অসামান্য স্মৃতিশক্তির অধিকারী। একই সঙ্গে ডান হাতে বাম কান আর বাম হাতে ডান কান টানার মধ্যে দিয়ে দুই দিকের টেম্পোরাল লোবকেই উদ্দীপিত করার পদ্ধতি প্রাচীন মুনিঋষিই প্রথম আবিষ্কার করেন। আধুনিক স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞরাও পার্কিনসন্স ডিজিজে মস্তিষ্কের গভীরে গিয়ে উদ্দীপনার সাহায্যে ব্যাধির উপাচার করেন।

টেম্পোরাল লোবের প্রধান তিনটি অংশ হচ্ছে সমুদ্রঅশ্বের মতো হিপোক্যাম্পাস, অ্যামিগডালা ও এক সেন্টিমিটার পুরু টেম্পোরাল কর্টেক্স, যার কাজ সমস্ত তথ্যকে স্মৃতির ভাণ্ডারে জমিয়ে রাখা। হিপোক্যাম্পাসের কাজ শব্দের এনকোডিং এবং বিশ্লেষণ করা। আশঙ্কা, ভয়, উদ্বেগাদি আবেগকে স্মৃতিতে ধরে রাখার কাজ করে অ্যামিগডালা। কানেরও তিনটি ভাগ আছে। বহিঃকর্ণের কাজ চতুর্দিক থেকে সমস্ত শব্দশক্তিকে সংগ্রহ করে কর্ণপটহে কেন্দ্রীভূত করা। 'যার যত বড়ো কান, সে হয় তত বুদ্ধিমান'। প্রসঙ্গক্রমে, বুদ্ধদেবের বিশাল কানের উল্লেখ করা যায়। মধ্যকর্ণের কাজ শব্দের কম্পনকে অন্তঃকর্ণে পাঠানো। অন্তঃকর্ণের সঙ্গে ওই টেম্পোরাল লোবের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। কর্ণেন্দ্রিয়ের কাজ শুধু শব্দগ্রহণ নয়, তাকে মস্তিষ্কের টেম্পোরাল লোবের মধ্যে স্মৃতিভাণ্ডারে পাঠানো, বিশ্লেষণ করা, জমা রাখা এবং প্রয়োজন তাকে প্রত্যাহারের মাধ্যমে কাজে লাগান।

বিজ্ঞানীর কল্পনায় মস্তিষ্কের মধ্যেই বাস করে 'হোমানকুলাস' নামে কিম্ভুতকিমাকার এক ক্ষুদ্র মানব। তার হাত, ঠোঁট, জিভ ও চোখ-মুখ-সহ মুখমণ্ডলটি দেহের অন্য অংশের তুলনায় বিশাল। সব ইন্দ্রিয়ের স্থানও হলো মুখমণ্ডল। আয়তনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এই অঙ্গগুলিতে আছে সূক্ষ্ম স্নায়ুর সর্বোচ্চ সমাবেশ। সেজন্য এই অংশগুলি অত্যন্ত সংবেদনশীল। দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তির সঙ্গে মনন, চিন্তন ও স্মৃতির গভীর সম্পর্ক আছে। দুই দিকের মস্তিষ্কের হোমানকুলাসে টেম্পোরাল লোবের উপরেই হাতের আঙুল ও কানের অবস্থান। এক সঙ্গে দুই হাত দিয়ে কর্ণমর্দন করলে তড়িদ্গতিতে উভয় মস্তিষ্কের টেম্পোরাল লোবে স্পন্দনের সৃষ্টি হয়। এই ভাবে উদ্দীপিত দুই মস্তিষ্কের শ্রবণকেন্দ্রে সব তথ্যের সমাবেশ, এনকোডিং, স্মৃতির সংরক্ষণ এবং প্রয়োজনে প্রত্যাহার হয়ে থাকে। ভ্রামরী নামক প্রাণায়ামে চোখ-কানের উপর চাপ দিয়ে ভ্রমরগুঞ্জন করলে টেম্পোরাল লোবে কম্পনের সৃষ্টি হয় এবং দৃষ্টি, শ্রবণ, স্মৃতি ও মনন শক্তির বৃদ্ধি হয়।

চীনে প্রচলিত আকুপাংচার ব আকুপ্রেসারের দৃষ্টিকোণ থেকে বলা হয়, কর্ণের বিভিন্ন বিন্দুকে আঙুলের ডগা দিয়ে উদ্দীপিত করলে, উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা, স্মৃতিভ্রংশ ও উন্মত্ততার নিরাময় হয়। তারা বলেন, 'কাই' নামক এক অদৃশ্য শক্তি নাকি কানের মেরিডিয়ান ধরে মস্তিষ্কে পৌঁছে একাগ্রতা ও মনঃসংযোগ বাড়িয়ে ধীশক্তির বিকাশ ঘটায়। দুই হাতে দুই বহিঃকর্ণের উপর চাপ দিলে তা সক্রিয় হয়ে উঠে। তাতে স্মরণশক্তির সঙ্গে মনকে ধীরস্থির করার ক্ষমতাও বাড়ে। আকুপ্রেসারের দৃষ্টিতে বহিঃকর্ণের বিভিন্ন অংশে চাপ দিয়ে শরীরের বিভিন্ন ভাগের চিকিৎসাও করা হয়। হিন্দুদের মধ্যে পুরুষের কর্ণচ্ছেদ করার প্রাচীন রীতি আজ লুপ্ত প্রায়। শুধুমাত্র নারীদের মধ্যেই চালু আছে। কারণ হিসেবে বলা হয়, এতে মেয়েদের মাসিক সমস্যার নিরসন হয় এবং প্রজনন ক্ষমতাও বাড়ে। বাল্যকালে শিক্ষকরা কর্ণমর্দনের দ্বারা শাস্তি দিতেন কিন্তু স্নায়ুবিজ্ঞানীরা বলেন, উচ্চ কম্পঙ্কের মস্তিষ্কস্থিত বিটা তরঙ্গের আধিক্যে, বাল্যাবস্থায় মৃগীরোগ যাকে 'পেটিট মাল বা এবসেন্স সিজার' বলে, তার নিরাময় সম্ভব। কর্ণমর্দনের দ্বারা উচ্চ এমপ্লিচুডের আলফা তরঙ্গ সৃষ্টি করে। শিশুদের এডিএইচডি বা 'অন্যমনস্কতা ও অতি চঞ্চলতা' ব্যাধির উৎপত্তির স্থলও হলো ওই টেম্পোরল লোব। কর্ণমর্দন কি তাহলে মস্তিষ্কের ওইসব ব্যাধিনিবারণ করতে পারত?

উঠ-বসের সময় গভীরভাবে শ্বাস গ্রহণ করে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বিরুদ্ধে উঠতে হয় আর বসার সময় গভীরভাবে শ্বাস ত্যাগ করতে হয়। এই কায়িক পরিশ্রমে দেহে উত্তাপের সৃষ্টি হয় এবং রক্তবহনালীর আয়তন বৃদ্ধি পায়। রক্তে অক্সিজেন এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইডের মাত্রা যথাক্রামে বাড়ে ও কমে। জঙ্ঘা ও পিঠে শিরদাঁড়ার পশের ইরেকটার মাংসপেশী ছাড়াও, সারা দেহের মাংসপেশী ও মস্তিষ্কে রক্তসংবহন সচল হয়ে উঠে। মস্তিষ্কে রক্তসংবহন বৃদ্ধির কারণে অক্সিজেন, গ্লুকোজ ও অন্যান্য পোষকতত্ত্ব সৃষ্টি হয়। গীতার উপদেশে 'শির ও গ্রীবা'কে সোজা রেখে ধ্যান করতে হয়। উঠ-বস করলে সুষুম্নাকাণ্ড ও স্নায়ুতন্ত্র দিয়ে রক্তসংবহন ও বিদ্যুৎপ্রবাহ অবাধ গতিতে প্রবাহিত হয়। এতে মনের চঞ্চলতা কমে এবং ধীশক্তির উন্মেষ ঘটে।

মন্ত্রোচ্চারণে হিপোক্যাম্পাসের কর্মশক্তি অর্থাৎ স্মরণ রাখার ক্ষমতা বাড়ে। পাপ বা অপরাধ বোধ এবং ক্ষমা প্রার্থনার মধ্যে দিয়ে যে অনুভূতি ও উদ্বেগের সৃষ্টি হয় তাতে অ্যামিগডেলা সক্রিয় হয়ে উঠে। যে কোনো কিছুর পুনরাবৃত্তিতে তার শক্তির বৃদ্ধি হয়। তাই ৮, ১৮,২৮ বা ১০৮ বার উঠ-বস শুধু প্রতীক মাত্র। এর পিছনের অন্তর্নিহিত রহস্য হলো পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে স্মৃতির ভাণ্ডারকে পূর্ণ করা।

উপসংহারে বলা যায়, কন ধরে উঠ-বস করার প্রাচীন শাস্তি পদ্ধতির পিছনে আছে এক গভীর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা, যা আমাদের দেওয়া পূর্বপুরুষদের এক অমূল্য উপহার। চীনের প্রাণিক আরোগ্য পদ্ধতির গ্র্যান্ডমাস্টার চোয়া কোক সুই আজ পৃথিবীর অন্যতম ধনী চিকিৎসক যিনি হঠযোগ, কুণ্ডলিনী শক্তি ও আয়ুর্বেদের উপর গবেষণা করে পেটেন্ট নিয়েছেন। আর আমরা তাঁরই কাছ থেকে ওই জ্ঞান অর্জন করছি অর্থের বিনিময়ে। □

হিন্দু রাষ্ট্র মানেই ধর্মীয় রাষ্ট্র নয়

রবিশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

সম্প্রতি ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আওয়াজ উঠছে অবিলম্বে ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র ঘোষণা করা হোক। এ যেন এক অপ্রকাশ্য আকাঙ্ক্ষার সম্মিলিত সোচ্চার, যেন এক পরিণত মাহেন্দ্রক্ষণের শুভ মহরত। কিন্তু সমস্যা হলো এই দাবিকে নস্যাৎ করতে বহু রাজনৈতিক দল তথা আধুনিক তথাকথিত সেকুলার বুদ্ধিজীবী সবকিছু গেল গেল রব তুলে প্রতিবাদ মুখর আচরণ করা শুরু করে দিয়েছেন। ঠিক যেভাবে আমাদের পূর্বতন কংগ্রেসি রাজনৈতিক জ্যাঠামশাইরা কিংবা কাকাবাবু পন্থী ভুঁইফোঁড় বাম সমর্থকেরা যুগ যুগ ধরে করে এসেছিলেন। অবশ্য, এদের আজ না আছে রাজ্যপাট, না আছে অস্তিত্ব, ফোঁসখানি শুধু বিরোধিতা করার জন্যই আছে। এরা হিন্দু আর হিন্দুত্বকে গুলিয়ে ফেলেছেন। সংকীর্ণতাবাদে বিশ্বাসী এই সব দলের মানুষজন জনগণকে ভুল বুঝিয়ে হিন্দু রাষ্ট্রের অন্তর্দৃষ্টিকে বিপথগামিতায় প্রতিষ্ঠিত করার মরিয়া প্রয়াস সৃষ্টি করেছেন। তাতে কি কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা সত্যিই লাভ করেছিল? না, ভারত ভাগ করা হয়েছিল দ্বিজাতি তত্ত্বকে হাজির করে। যার একটি ছিল আমাদের এই প্রিয় হিন্দুস্থান। কিন্তু এখানে হিন্দু শব্দটির উৎসগত দিকটি ভালো করে বুঝতে হবে। হিন্দু এখানে কোনো বিশেষ জাতি বা ধর্মাবলম্বী মানুষকে নির্দেশ করে না।

সিন্ধু সভ্যতাবাসী মানুষের সিন্ধু নামের ডাকের অপভ্রংশ রূপই হলো হিন্দু। যদিও পরবর্তী ক্ষেত্রে ভারতবর্ষে যা কিছু শুভ নীতি ও মূল্যবোধ, তার সব কিছুর উৎসই হলো সনাতন হিন্দু ধর্ম। হিন্দুস্থান ও হিন্দু একে অপরের পরিপূরক। 'হিন্দু' নামক এই দুটি অক্ষরের শব্দের মধ্যে অনাদি অনন্তকাল ধরে অন্তর্নিহিত হয়ে আছে শত সহস্র স্বতন্ত্র বৈচিত্র্য তথা বস্তুগত সাম্য, যার কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। স্বামীজী দীপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, ‘‘আমরা হিন্দু। আমি এই হিন্দু শব্দটি কোনও মন্দ অর্থে ব্যবহার করিতেছি না, আর যাঁরা মনে করেন তাঁদের সহিত আমার মতের মিল নই, আমাদিগেরই উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে— 'হিন্দু' নাম সর্ববিধ মহিমময় সর্ববিধ আধ্যাত্মিক বিষয়ের বাচক হইবে, অথবা চিরদিনই ঘৃণাসূচক নামেই পর্যবসিত হইবে, অথবা উহার দ্বারা পদদলিত অপদার্থ ধর্মভ্রষ্ট জাতি বোঝাইবে। যদি বর্তমানকালে হিন্দু শব্দে কোনো মন্দ জিনিস বোঝায় বোঝাক। এস, আমাদের কাজের দ্বারা লোককে দেখাইতে প্রস্তুত হই যে কোনো ভাষাই ইহা অপেক্ষা উচ্চতর শব্দ আবিষ্কার করতে সমর্থ নহে। আমি নিজেকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে গর্ব অনুভব করি। এখন 'ধর্ম' ও 'হিন্দু'— এই শব্দ দুটি একার্থবাচক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাই আমাদের জাতির বিশেষত্ব। ইহাতে আঘাত করিবার উপায় নাই।’’

আসলে হিন্দু শব্দটির উৎসগত অর্থ হলো, 'হীনং দূষয়তি স হিন্দুঃ অথবা হীনং দূরয়তি স হিন্দুঃ। অর্থ হলো, হীনতাকে যে বর্জন করে সেই হিন্দু। স্বাভাবিক ভাবেই স্বামীজী যে নিজেকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে গর্ব অনুভব করতেন, সেটা এই সদ্‌গুণ মণ্ডিত উচ্চ চিন্তা চেতনার এক উৎকৃষ্ট গুণমানতাই বাস্তব প্রতিফলন। হিন্দু কোনো সম্প্রদয়গত সংকীর্ণ শব্দ নয়, এর মধ্যে যে লুকিয়ে আছে বিশ্ববন্দিত অনতিক্রম্য শাশ্বত মূল্যবান সৌভ্রাতৃত্ব বোধ, যে বিশ্বমেকনীড়ম, যে বসুধৈব কুটমম্বম্ সেটা বুঝি সর্বপ্রথম সুন্দর ভাবে আত্মস্থ করতে সক্ষম হয়েছিলেন বিবেকানন্দ।

তিনি বুঝতে পেরেছিলেন মহান এই শব্দের কী সীমাহীন গভীরতা, কি অনন্ত প্রসারতা এবং কালজয়ী তাৎপর্যপূর্ণ দ্যোতনা। মহাযোগী শ্রীঅরবিন্দ তাঁর ঐতিহাসিক উত্তরপাড়া অভিভাষণে বলেছিলেন, শুধু ভারতবর্ষের জন্যই নয়, সমগ্র বিশ্বের জন্য চাই হিন্দু তথা সনাতন ধর্ম। স্বামীজী বলেন, 'কেবল তখনই তুমি হিন্দু পদবাচ্য যখন ওই নামটিতেই তোমার ভিতরেও মহাবৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চারিত হইবে তখন— কেবল তখনই তুমি হিন্দু পদবাচ্য হইবে, যখন যে কোনো দেশীয়, যে কোনো

ভাষাভাষী হিন্দু নামধারী হইলেই অমনি তোমার পরমাত্মীয় বোধ হইবে। হিন্দু মনীষীদের সম্বন্ধে অধ্যাপক 'ম্যাক্সমূলার' বলেছিলেন যে, 'তাঁহারা এত উচ্চে উঠিয়াছেন যে, সেখানে তাঁহাদের ফুসফুস শ্বাস গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু অপর দার্শনিকদের ফুসফুস ফাটিয়া যাইত। হিন্দু হলো প্রবক্তা নিরপেক্ষ, সম্প্রদায় বর্জিত, শাশ্বত সনাতন ও অপৌরষেয় অনাদি সর্বগ্রাহী গণ্ডী ভাঙা এক চিরন্তন সত্যের মতবাদ; সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক দিব্য গুণাবলী এক তাৎপর্যপূর্ণ দ্যোতানা। হিন্দু কোনো সম্প্রদায়গত প্রতিনিধিত্ব করে না। তাই পবিত্র এই সনাতনী শক্তি স্বাভাবিকভাবেই বিশ্বজনীন ও বিশ্ববন্দিত। বিশ্ব জনীন কারণ, হিন্দু কোনো ধর্মীয় প্রতিনিধিত্ব করে না, এমনকী কোনো সীমিত গোষ্ঠীকে উপকৃত করার সংকীর্ণ গণ্ডী থেকেও মুক্ত। এতটাই প্রাচীন যে জগৎসংসারে হিন্দুধর্ম কে প্রথম জনসমক্ষে আনল, এ ইতিহাস আজও অজানা। এতটাই প্রাচীন যে এই সনাতন হিন্দু যে আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে রামায়ণ, মহাভারতের যুগেও এই শব্দের কোনও উল্লেখ নেই।

কালচক্রে হিন্দু শব্দটি শাস্ত্রে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং হিন্দুধর্মে প্রবাহিত হয়েছে। সভ্যতার ক্রমবিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের রুচি ও সংস্কারের পরিবর্তন ও সংযোজন ঘটেছে। জন্ম হয়েছে সারভৌম ও স্বতন্ত্র সত্তা সংবলিত প্রতিষ্ঠিত সত্তা। সৃষ্টি হয়েছে নতুন নতুন ধর্ম-মার্গ, একক প্রবক্তার আদর্শ ও ধর্মমার্গ— শিখ, বৈদিক, শাক্ত, বৌদ্ধ, জৈন, শৈব, বৈষ্ণব। এই সব ধর্মমার্গ বিশ্বাস করে নিজ নিজ সৃষ্ট ইষ্ট দেবতাকে, তথাপি প্রতি মুহূর্তেই সৃষ্ট নতুন ধর্ম মার্গ হিন্দুত্বের মূল স্রোতের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাকে ক্রমাগত উৎকৃষ্ট মর্যাদায় পুষ্ট করে তুলেছে। অলৌকিক এই শব্দমাধুর্যে আটকে পড়ে আছে শত সহস্র বৈচিত্র্যময় অন্তর্নিহিত বস্তুগত সাম্য। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে সম্প্রতি ভারতের সাংস্কৃতিক পরিবেশে 'হিন্দু' শব্দটিকে সুপরিকল্পিত ভাবে এক অতি উগ্রশক্তি রূপে মূল্যায়ন করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যার নেপথ্যে আছেন আমাদের দেশের কিছু সেকুলার পন্থী রাজনৈতিক, অতি বামপন্থী তথাকথিত বুদ্ধিজীবী আর ওপার বাংলা থেকে ঘাড় ধাক্কা খাওয়া তাড়া খাওয়া কিছু মাস মাহিনার কবি সাহিত্যিক। শুধু মাত্র সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থের জন্যই বিরোধিতা করে যাচ্ছেন হিন্দু শব্দের। অবশ্য ভেকধারী মুখোশ পরা এই সমস্ত ততাকথিত বুদ্ধিজীবী বামপন্থী সেকুলারপন্থী বা মানবাধিকার সংগঠনের সদস্যরা যাদের মূল উদ্দেশ্যই হলো 'ডিভাইড অ্যান্ড রুলে'র মাধ্যমে ভারতের শাসন ব্যবস্থাকে কায়েম রাখা, তাদের কাছে অবশ্যই হিন্দু শব্দটি অত্যন্ত আতঙ্কের।

নিজদেরকে এরা হিন্দু হয়েও হিন্দু বলতে লজ্জা বোধ করেন, নিজেদের সেকুলার বলতেই বেশ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। হিন্দু এদের কাছে প্রত্যাশিত পদদলিত চিরকাল। তাই স্বাধীন ভারতে এই শব্দটিকে সমূলে উৎপাটিত করতে নয়া কৌশল হিসেবে তাঁরা 'সেকুলার' নামক এক উৎকট অযাচিত প্রহসন মূলক শব্দবন্ধ ইউরোপ থেকে আমদানি করে ভারতীয় সংবিধানে এক চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করতে আগেভাগেই অতি সক্রিয় ছিলেন। এখন প্রসহনটি একবার ভালো করে দেখে নেওয়া যাক। বিভিন্ন সর্বজনীন গ্রহণযোগ্য যে সমস্ত স্বীকৃত অভিধান যেমন Oxford, AT Dev, Random House, প্রভৃত আছে, সেখানে সেকুলার শব্দটির অর্থ হচ্ছে, (1) Pertaining to worldly things or to things that are not regarded as religious, spiritual or sacred, (2) Not pertaining to or connected with religion (opropossed to sacred, (3) Temporal, (4) Profane, (5) Lay, (6) Not distictly ascred or essential, (7) Not monastic etc. অর্থাৎ সেকুলরিজমের অর্থ বলা হচ্ছে, (1) A system of political of social philosophy that rejcts all forms of religious faith, (2) The view that public education and other matters of civil policy should be conducted without the introduction of a religious elemnt. অর্থাৎ সেকুলার শব্দটির অর্থ হলো ধর্মবর্জিত, যেখানে রাজ্য, শিক্ষা, নীতি সর্বক্ষেত্রে ধর্ম মুক্ত রাখবার মতবাদ। এমনকী সংস্কৃত ও বাংলাতেও বলা আছে লৌকিক, ঐহিক, সাংসারিক, পার্থিব বিষয় সম্বন্ধীয় যা কিছু অধ্যাত্ম-বিষয়ক নয়, লোকায়ত বা ধর্মনিরপেক্ষ। সার্বিক বিচার বিবেচনা করে যা দাঁড়ায় তা হলো, সেকুলার মানে ধর্মবর্জিত।

ধর্মনিরপেক্ষ মানেই হলো ধর্মের পক্ষে নাই। অর্থাৎ না ধর্ম, না স্থান, সবই নাবাচক। স্বাভাবিকভাবেই সেকুলার মানে সব ধর্মের প্রতি সমান মর্যাদা প্রদান বা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন নয়। অথচ ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস, স্বাধীনতার এতগুলো বছর পরেও কত সুকৌশলে সম্প্রদায়গত পক্ষপাতিত্বের মাধ্যমে আজও শুধুমাত্র হিন্দু নামক বিশ্ববন্দিত অনতিক্রম্য সর্বজনীন গ্রহণযোগ্য সত্যকে পরাভূত করার বিকল্প হিসেবে সেকুলার নামক এক উৎকট বৈষম্যমূলক প্রহসনকে যুগের পর যুগ সংবিধানে কারারুদ্ধ করে রাখা হলো নেপথ্যের চালাকিকে কায়েম রাখার খেলায়। সেই জন্যই হিন্দুদের পরম আরাধ্য দেব-দেবীদের নিয়ে বা ঋষি-মনীষী, মহাপুরুষদের নিয়ে সীমাহীন কদর্য মন্তব্য করলেও সেটা বৃহত্তর গণতন্ত্রের সাপেক্ষে 'সেকুলারিজম', অথচ হিন্দু হয়ে এই কদর্য মন্তব্যের প্রতিবাদ করলেই সাম্প্রদায়িক। এই সেকুলার নামক বিষবৃক্ষের ফল খেয়েই হিন্দু নামক জাতির সর্বাঙ্গ আজ বিষজর্জর। সেকুলার শব্দটি যে অর্থে ইউরোপীয় সংস্কৃতিতে প্রযোজ্য, তা ততটাই অর্থহীন ভারতীয় সংস্কৃতিতে।

আজ থেকে বহু আগে ভারতবর্ষ ও হিন্দুস্থান এক এবং সমার্থক শব্দ হিসেবে পরিগণিত হতো। কারণ তখনও অন্যান্য ধর্মের আবির্ভাব ভারতবর্ষে ঘটেনি। সভ্যতা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি সর্বক্ষেত্রেই বিরাজ

করত এক অনাবিল আধ্যাত্মিকতা। অন্যান্য ধর্মের প্রবেশাধিকারের সঙ্গে সঙ্গে সনাতন হিন্দুত্ব একটু একটু করে হারাতে লাগল তার মহামূল্যবান কৌলিন্যতা। সর্বগ্রাসী জড়বাদী ও ভোগবাদী আগ্রাসন ও বর্বরোচিত সাম্রাজ্যবাদের সুপরিকল্পিত উপর্যুপরি হানাদারি এবং দখলদারিত্বে হিন্দু সনাতন সভ্যতার অবশ্যম্ভাবী পতন অনিবার্য হয়ে উঠল। সমগ্র আর্যাবর্তে নেমে এল এক ঘোর অন্ধকারময় অমাবস্যা। হিন্দু সমাজের উপর সীমাহীন দমনপীড়ন অকথ্য অত্যাচার কার্যত ভারতাত্মাকে করতে লাগল রক্তরঞ্জিত ও বহুধাবিভক্ত। পৈশাচিক শক্তির অন্ধ কারাগারে বন্দি থেকে গেল হিন্দু সনাতন সভ্যতা। সুদীর্ঘ আটশো বছরের অমানবিক অত্যাচারের অন্ধকূপে।

বিগত আটশো বছরের ধারাবাহিক ইতিহাস ঘাঁটলেই পাওয়া যাবে যে সেখানে এমন কোনো শাসকের দৃষ্টান্ত নেই যাঁরা নিজ নিজ ধর্মমত প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সনাতন হিন্দুত্বকে সুরক্ষা প্রদান করেছেন বা সম্মান প্রদর্শন করেছেন। প্রকৃত ইতিহাস সর্বদাই আড়ালে রাখা হয়েছে। যুগ যুগ ধরে উগ্র অপশাসনের মধ্যে দিয়ে সমস্ত সনাতন ভাবধারাকে নির্বিচারে পদদলিত করা হয়েছে। অবাধ লুটপাট, নৃশংস হত্যা, নারী ধর্ষণ, পরস্ত্রী হরণ, অগ্নিসংযোগ, ধর্মান্তরকরণ, পরাজিত হিন্দু রাজাদের অসহায় পত্নীদের ভোগের নৈবেদ্য বানানো, নির্বিচারে লক্ষ লক্ষ হিন্দু হত্যা, প্রাচীন মন্দির, মুর্তি, গ্রন্থাগার ধ্বংস করা ছিল বহিরাগত শাসকদের অপশাসনের রোজনামচা। সেদিনও সনাতনী হিন্দু মুখ বুজে সহ্য করে গেছে শুধু সনাতন সংস্কৃতিতে পুষ্ট ছিল বলে, আর আজও হিন্দু ভাবাবেগ, হিন্দু সংস্কৃতি আক্রান্ত হলে সেকুলারিজমের বুলি আওড়ে হালকা করে দেখা হয়, আর ধর্ম, সংস্কৃতিকে রক্ষা করার জন্য এর প্রতিবাদ করলেই পলকেই সেটা হয়ে যায় সাম্প্রদায়িকতা এবং উগ্র হিন্দুত্ববোধের তকমা লাগিয়ে বড়ো বড়ো ক্যাপশানে লেখা বেরিয়ে যায় পেটোয়া সংবাদপত্রে।

অনেকেই বলে থাকেন দীর্ঘ দুশো বছরের ধারাবাহিক ব্রিটিশ অপশসনের পর আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। কিন্তু বাস্তব হলো সুদীর্ঘ হাজার বছরের ধারাবাহিক গোলামির পর আমরা স্বাধীনতা পেয়েও পরাধীন হয়ে আছি। কারণ গণতন্ত্র এখানে কাগজে কলমে। মেকি গণতন্ত্রের আড়ালে অনেক আগেই আমাদের রাজনৈতিক জ্যাঠামশরা জন্ম দিয়ে সযত্নে লালন পালন করে বড়ো করে গেছেন সেকুলারিজমের বিষবৃক্ষ। যার নিয়মিত সেবনে সনাতনী হিন্দুর সর্বাঙ্গ হয়েছে বিষজর্জর। তবুও নিশ্চুপ। প্রতি বছরই ঘটা করে দেশের সর্বত্রই স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। পালন করা হয় গণতন্ত্র দিবসও, কিন্তু উড়ন্ত তেরঙ্গা পতাকার আড়ালে ছদ্মবেশ সেকুলাররিজম বড়ো অসহায় হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। আর আমরা শুধু এই ভজনা করে যাব, 'বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান'। হানাদররা নালন্দা বিশ্ববিদ্যলয় জ্বালিয়ে দেবে, সোমনাথ মন্দির লুণ্ঠিত হবে, কোটি কোটি অসহায় সনাতনী আত্ম বলিদান দেবে নিজ ধর্ম রক্ষার্থে, তবুও রমেশ চন্দ্রের মতো দেশীয় ইতিহাসবিদের ইতিহাস অস্বীকার করে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে সাক্ষী থাকবে বিদেশি ইতিহাসবিদের রচিত ইতিহাস।

হিরো বানিয়ে রাখা হবে এইসব হানাদারদের, আর নীরবে মুদ্রিত থাকবে স্থবির ভারতবর্ষের অসমর্থ সনাতনী হিন্দুদের পরাক্রমতা। সারা ভারতে এখন বহু প্রতীক্ষিত সেই হিন্দু রাষ্ট্র ঘোষণা করার সব সম্ভাবনা প্রবল হয়েছে। আর দেরি নয়, জনবিন্যাসের অঙ্কে হিন্দু জনসংখ্যা পঞ্চাশ শতাংশের নীচে নেমে এলে ইতিহাস সাক্ষী, এই তথকথিত সেকুলার ভারতও অহিন্দু জেহাদিদের দখলে চলে যাবে, ভারতবর্ষের বুকে নেমে আসবে আরও একটা অন্ধকারময় যুগ, ঠিক যেভাবে ইন্দোনেশিয়া, গান্ধার, শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান। সারা পৃথিবীতে তো অনেক ধর্মের দেশ আছে, সেখানে কোনো অসুবিধা নেই, শুধুমাত্র পৃথিবীর বুকে হিন্দু রাষ্ট্রের যত অসুবিধা, কেন? আবারও বলছি যেহেতু হিন্দু কোনো নির্দিষ্ট একটি ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করে না, তাই হিন্দুরাষ্ট্র হওয়ার অর্থ কোনো ধর্মীয় রাষ্ট্র নয়। বরং হিন্দু নামক এক উচ্চ সাংস্কৃতিক মার্গের আদলে যে, রাষ্ট্রীয় সভ্যতা গড়ে উঠবে, সেখানে পৃথিবীর সব ধর্মের মানুষ থাকবে সুরক্ষিত ও মর্যাদাসম্পন্ন। □

ভারতই হবে পরবর্তী সুপার পাওয়ার : মোহনরাও ভাগবত

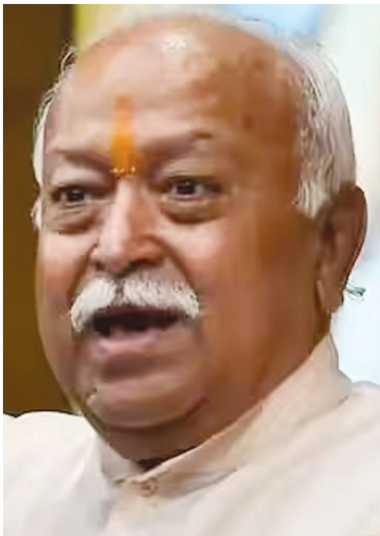

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত সম্প্রতি বলেছেন, সারা বিশ্ব এখন মেনে নিয়েছে যে ভারতই হবে পরবর্তী সুপার পাওয়ার। তিনি বলেন, ‘বিশ্বগুরু হবার পথে ভারত ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে এবং আমাদের এই লক্ষ্য অর্জন করতেই হবে। ভারতই পরবর্তী সুপার পাওয়ার। একথা শুধু আমরা নই, সারা বিশ্ব বলছে।’ শ্রী ভাগবত একথা বলেন জবলপুরের একটি সাধুদের সমাবেশে।

উল্লেখ্য, স্বামী দেবাচার্য মহারাজের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এই সভার আয়োজন করা হয়েছিল। স্বামী দেবাচার্য মহারাজ ২০২১ সালে করোনায় আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হন।

সরসঙ্ঘচালক বলেন, ‘বিশ্বের ক্ষমতাধর দেশগুলি নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠায় যখন যুদ্ধবিগ্রহে জড়িয়ে পড়েছিল তখন আমরা যুদ্ধে আহতদের সেবা করেছি। আমাদের ত্রিকালজ্ঞ ঋষিরা সমাজের সব থেকে বেশি সেবা করেছেন। সেই কারণেই ভারত আগামীদিনে সুপারপাওয়ার হয়ে উঠবে। শক্তি ছাড়া এই উত্থান সম্ভব হবে না। স্বয়ং মহাদেবেরও শক্তির প্রয়োজন হয়। তবে আমাদের শক্তিশালী হয়ে উঠতে চাওয়ার উদ্দেশ্য কাউকে যন্ত্রণা দেওয়া নয়, বরং সারা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং দুর্বলকে রক্ষা করার জন্যেই এই শক্তি প্রয়োগ করা হবে।’ সব শেষে শ্রী ভাগবত মনে করিয়ে দেন, ‘আমরা কাউকে হারাতে আসিনি, কাউকে বদলে দিতেও আসিনি। আমরা ধর্মের পথে চলতে এসেছি।’

সরকারি দপ্তর ও সংস্থায় ৭১ হাজার নিয়োগপত্র বিতরণ প্রধানমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গত ১৩ এপ্রিল ভিডিয়ো কনফারেন্সিঙের মাধ্যমে জাতীয় রোজগার মেলায় ভাষণ দিয়েছেন। তিনি বিভিন্ন সরকারি দপ্তর এবং সংস্থায় নব-নিযুক্তদের মধ্যে ৭১ হাজার নিয়োগপত্র বিতরণ করলেন। সারা দেশ থেকে নির্বাচিত নতুন নিযুক্তরা ভারত সরকারের বিভিন্ন দপ্তর এবং পদে যোগ দেবেন যেমন, ট্রেন

ম্যানেজার, স্টেশন মাস্টার, সিনিয়র কর্মাশিয়াল- কাম-টিকিট ক্লার্ক, ইনস্পেক্টর, সাব-ইনস্পেক্টর, কনস্টেবল, স্টেনোগ্রাফার, জুনিয়র অ্যাকউন্ট্যান্ট, পোস্টাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, ইনকাম ট্যাক্স ইনস্পেক্টর, ট্যাক্স অ্যাসিস্ট্যান্ট, সিনিয়র ড্রাফটসম্যান, জেই/সুপারভাইজার, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, টিচার, লাইব্রেরিয়ান, নার্স, প্রবেশনারি অফিসার, পিএ, এমটিএস প্রভৃতি। নব-নিযুক্তরা বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে সকল নবনিযুক্তদের জন্য অনলাইন ওরিয়েন্টেশন কোর্স ‘কর্মযোগী প্রারম্ভ’-এর মাধ্যমে নিজেদের প্রশিক্ষিত করে তুলতে পারবেন। প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের সময় মেলার সঙ্গে ৪৫টি স্থানকে যুক্ত করা হয়েছিল।

প্রধানমন্ত্রী বৈশাখীর পবিত্র দিন উপলক্ষ্যে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানান। তিনি প্রার্থী এবং তাঁদের পরিবারকে নিয়োগপত্র পাওয়ার জন্য অভিনন্দন জানান। প্রধানমন্ত্রী বলেন যে সরকার উন্নত ভারতের সংকল্প পূরণে দেশের যুব সমাজের মেধা এবং প্রাণশক্তির জন্য সঠিক সুযোগ দিতে দায়বদ্ধ। শ্রী মোদী সরকারি নিয়োগ প্রক্রিয়ার প্রসঙ্গটি তুলে ধরে বলেন যে এনডিএ-শাসিত রাজ্যগুলি যেমন গুজরাট থেকে অসম এবং উত্তরপ্রদেশ থেকে মহারাষ্ট্রে দ্রুতগতিতে নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে। তিনি বলেন, গতকাল শুধুমাত্র মধ্যপ্রদেশেই ২২ হাজারেরও বেশি শিক্ষককে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছে। ‘এই রোজগার মেলা দেশের যুব সমাজের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতার প্রমাণ।’ ভারত সারা বিশ্বের মধ্যে দ্রুততম অর্থনীতি জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, গোটা পৃথিবী আন্তর্জাতিক মন্দা এবং অতিমারীর সমস্যার মধ্যে ভারতকে একটি উজ্জ্বল বিন্দু হিসেবে দেখছে। আরও বলেন, ‘বর্তমানে নতুন ভারত যে নীতি এবং কৌশল নিয়ে এগোচ্ছে তাতে নতুন নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে গেছে।’ তিনি বলেন, ২০১৪-র পর ভারত আগেকার প্রতিক্রিয়াশীল অবস্থানের তুলনায় অতি সক্রিয় মনোভাব গ্রহণ করেছে। শ্রী মোদী বলেন, ‘এতে এমন একটি পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে যেখানে একবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক সাক্ষী থাকছে কর্মসংস্থান এবং স্বনিযুক্তির নানা সুযোগ-সুবিধার যা আগে কল্পনাও করা যেত না। যুব সমাজ এখন এমন এমন ক্ষেত্র পাচ্ছে যা ১০ বছর আগেও ছিল না।’ প্রধানমন্ত্রী একটি রিপোর্টের কথা বলেন যেখানে স্টার্ট-আপগুলি ৪০ লক্ষের বেশি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করেছে। তিনি কর্মসংস্থানের নতুন পথ হিসেবে ড্রোন এবং ক্রীড়াক্ষেত্রের কথাও উল্লেখ করেন।

জেনেরিক মেডিসিনের সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য জন ঔষধি মিত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ বিশেষত সমাজের আর্থিকভাবে দুর্বল মানুষদের জন্য সুলভ মূল্যের এবং উচ্চ মানের ওষুধের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার জন্য সারা দেশে জন ঔষধি কেন্দ্রগুলি প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী ডাঃ মনসুখ মাণ্ডভিয়া জেনেরিক ওষুধের ব্যবহার সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে এবং জন ঔষধি কেন্দ্রগুলিতে ওষুধের সুবিধাগুলি প্রচার করার জন্য তরুণদের জন ঔষধি মিত্র হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। ফার্মাসিউটিক্যালস বিভাগ ৭ মার্চ জন ঔষধি দিবস পালন করে এবং ১-৭ মার্চ পর্যন্ত সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল।

সকলে যাতে সুলভ মূল্যে ওষুধ পায়, সেই লক্ষ্য নিয়ে ২০০৮ সালের নভেম্বরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভারতীয় জন ঔষধি পরিকল্পনা চালু করা হয়েছিল। ৩১ জানুয়ারি, ২০২৩ পর্যন্ত ৯০৮২টি জন ঔষধি কেন্দ্র ভারতের ৭৪৩টি জেলায় গড়ে উঠেছে। ১৭৫৯টি বিভিন্ন ধরনের ওষুধ এবং ২৮০ ধরনের অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জাম যেমন প্রোটিন পাউডার, মল্ট-বেস্ট ফুড সাপ্লিমেন্ট, প্রোটিন বার, ইমিউনিটি বার, স্যানিটাইজার, মাস্ক, গ্লুকোমিটার ও অক্সিমিটার পাওয়া যায়।

কৃষকরা ই-নামের মাধ্যমে যে কোনো জায়গায় পণ্য বিক্রি করতে সক্ষম

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকার কৃষকদের কল্যাণে ধারাবাহিকভাবে এবং দ্রুত কাজ করছে। ন্যাশনাল এগ্রিকালচার মার্কেট (ই-নাম) সেই লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। কৃষকদের উপকার করতে এবং তাঁদের পণ্য বিক্রির উপায় পরিবর্তন করতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০১৬ সালের ১৪ এপ্রিল আটটি রাজ্যে ২১টি মান্ডি নিয়ে 'ই-নাম' প্রকল্প চালু করেছিলেন। এই উদ্যোগে যেখানে স্বচ্ছতা এসেছে, সেখানে কৃষকরাও অনেকাংশে উপকৃত হয়েছেন। এই স্কিমটি ভারতে প্রথমবার 'এক দেশ-এক বাজার' ধারণার বিকাশ করছে। ড. ভীমরাও আম্বেদকর দরিদ্র, অনগ্রসর শ্রেণী এবং কৃষকদের উন্নতির জন্য তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। এই কারণেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বাবাসাহেবের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে কৃষকদের জন্য জাতীয় কৃষি বাজার চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন।

ই-নামে নিবন্ধিত কৃষকের সংখ্যা—১,৭৪,৮৯,৩২৭। ২২টি রাজ্য এবং তিনটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে মোট বাজারের সংখ্যা—১২৬০।

নিবন্ধিত ব্যবসায়ী ২,৪০,৫০০। এফপিওস ২,৪৩৩ *(পরিসংখ্যান ৩ মার্চ, ২০২৩ অনুসারে)।*

- ই-নাম কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য দাম পেতে, পরিচালনমার স্বচ্ছতা এবং ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে নাগরিকদের ক্ষমতায়নে সহায়তা করছে।
- কিসান ই-নাম পোর্টালে বিনামূল্যে নিবন্ধন করা যায়। ওজনে স্বচ্ছতার জন্য, ইলেকট্রনিক স্কেল ব্যবহার করা যেতে পারে এবং ভিম পেমেন্ট সুবিধা ব্যবহার করা যেতে পারে।
- কৃষকরা তাঁদের উৎপাদিত পণ্য অনলাইনে বিক্রির জন্য ই-নাম পোর্টালে আপলোড করতে পারেন। ব্যবসায়ীরা যে কোনো জায়গা থেকে ই-নামের অধীনে কেনাকাটার জন্য দর করতে পারেন।

।। চিত্রকথা ।। মহামানব মহানামব্রত ।। ৪১ ।।

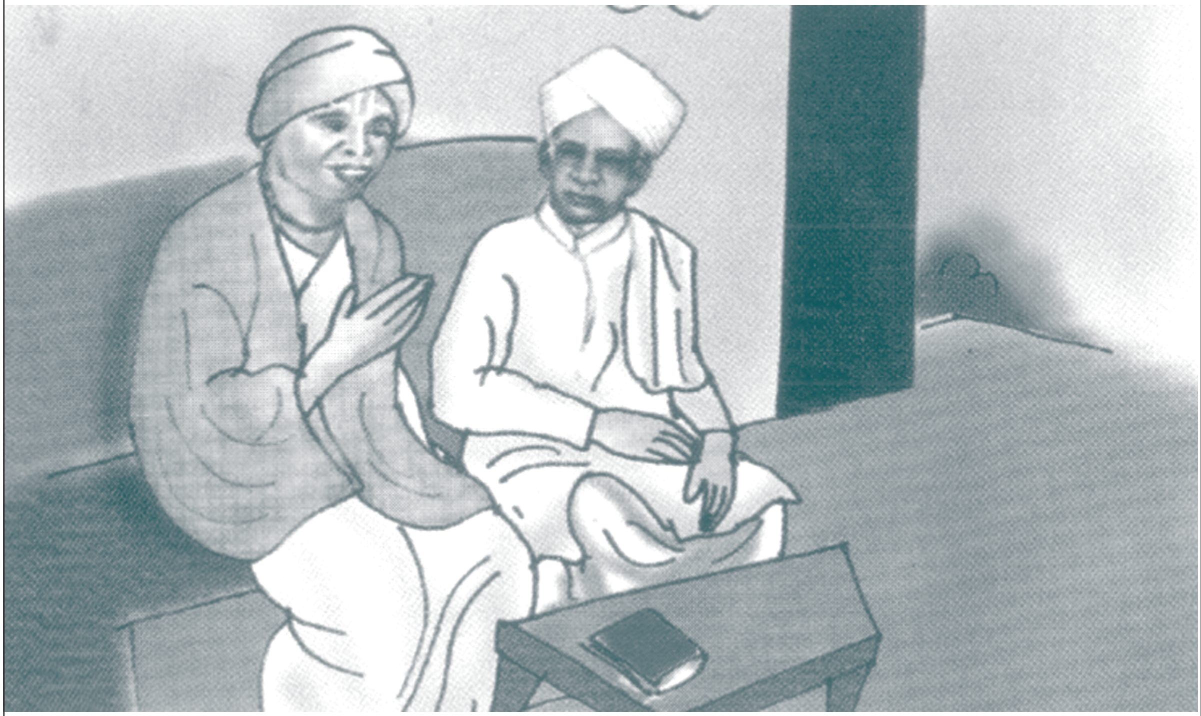

সভার শেষে দার্শনিক ডঃ রাধাকৃষ্ণনের সঙ্গে একান্তে ডঃ মহানামব্রতজী।

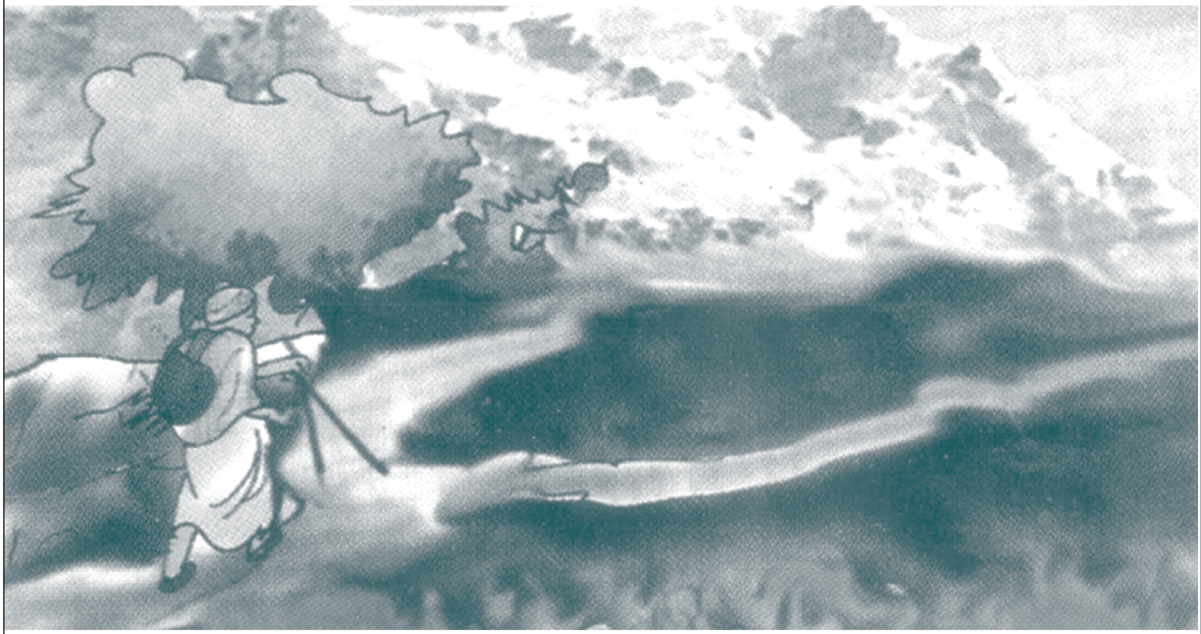

উত্তর-পূর্ব আমেরিকায় অতলান্তিকের প্রায় উপকূলে ৪০২০ ফুট উঁচু পাহাড় 'হোয়াইট ফেস'-এ আরোহণ করছেন ডঃ ব্রহ্মচারিজী, যান্ত্রিক জীবনের কোলাহল থেকে মুক্তি পেতে, সাধনার নির্জন পরিবেশ পেতে।

(ক্রমশ)